ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

১৮ আগস্ট ২০১১

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
রুমানা শারমিন, *অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*
ফাতেমা আফরোজ, *অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*
সাধন কুমার দাস, *ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*

গবেষণা সহযোগী
নিহার রঞ্জন রায়
মো. বুলবুল আহমেদ

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে নূর ইকবাল তালুকদার, হুর-এ-জান্নাত, এস এম রেজাউল করিম, এবং তানভীর শরীফ, এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, মো. ওয়াহিদ আলম, মু. জাকির হোসেন খান, মো. রেজাউল করিম, হাবিবুর রহমান, শহীদুল ইসলাম ও কবির আহমেদ, এবং অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ *iv*

সার-সংক্ষেপ *v*

এক নজরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি *xiii*

এক নজরে বিএনপি'র সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি *xix*

১. প্রেক্ষাপট ১

১.১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ১

১.২ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহার ১

২. গবেষণার যৌক্তিকতা ২

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ২

৪. গবেষণা পদ্ধতি ২

৫. গবেষণার আওতা ৩

৬. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩

৭. গবেষণার ফলাফল ৩

৭.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ৪

৭.২ কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা ৯

৭.৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ১৩

৭.৪ তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা ১৯

৭.৫ প্রশাসনের সংস্কার ২৫

৭.৬ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ ৩০

৭.৭ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ৩২

৭.৮ নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ ৩৭

৭.৯ মানবাধিকার নিশ্চিত করা ৩৯

৭.১০ নারীর ক্ষমতায়ন ৪৩

৭.১১ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন ৪৬

৭.১২ এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ৫০

৮. নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন: প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা ৫২

৯. উপসংহার ৫৪

১০. সুপারিশ ৫৪

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জনগণের মধ্যে প্রবলভাবে দুর্নীতিবিরোধী এবং সুশাসনের চাহিদার প্রতিফলন দেখা যায় প্রধান দলগুলোর নবম সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে। দুই বছরের অনির্বাচিত সরকারের শাসনের পর এই নির্বাচনকে নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা যেমন বেশি ছিল তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোও জনগণের প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দেখা যায় নির্বাচনের আগে বিভিন্ন অঙ্গীকার করা হলেও ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে আন্তরিক থাকে না।

নতুন সরকার প্রথম বছরে কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা, এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধিসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। তবে একইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, এবং সরকারি দলের অনুসারী সংগঠনগুলোর টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল-সন্ত্রাস ইত্যাদি কর্মকাণ্ড রোধে ব্যর্থতার কারণে সরকার ছিল সমালোচিত। এসব কারণে সরকারি দল তার নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাপেক্ষে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে তা নিশ্চিত করে দাবি করা যায় না।

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে না বা তারা অংশগ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে সরকার গঠনকারী দলেরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করার একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকে। অন্যদিকে সরকার গঠন না করলেও প্রধান বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারের পাশাপাশি সংসদে বিরোধী দল হিসেবে (যেমন বিভিন্ন আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে (যেমন দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতায়ন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে এই গবেষণার মাধ্যমে নবম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১১ এর জুলাই পর্যন্ত সরকারি ও প্রধান বিরোধী দল সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে তার একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, সাধন কুমার দাস, ফাতেমা আফরোজ এবং রুমানা শারমিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তথ্য সংগ্রহে তাদেরকে সহায়তা দিয়েছেন নিহার রঞ্জন রায় ও মো. বুলবুল আহমেদ। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে তাদের সহায়তা দিয়েছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও সদস্য হাফিজ উদ্দিন খান প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলকে আরও আন্তরিক ও উদ্যোগী করে তুলতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই বছর পর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অন্যতম। জনগণের দুর্নীতিবিরোধী এবং সুশাসনের চাহিদার সরাসরি প্রতিফলন দেখা যায় প্রধান দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবিলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য রোধ, এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা - এই পাঁচটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা, নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার, জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা, এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ক্ষমতাধর ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ, সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, এবং স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগের অঙ্গীকার করা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়। ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে আলোচনা, স্থায়ী কমিটিগুলো দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন, এবং বিরোধী দলের সদস্যদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সরকার গঠন করার পর গত দুই বছর কয়েকটি সংবাদপত্র জনমত জরিপ পরিচালনা করে যার মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের প্রতি জনগণের মনোভাব ও মূল্যায়ন তুলে ধরে। তবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের কোনো গবেষণা-ভিত্তিক উদ্যোগ দেখা যায়নি। যেহেতু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বক্তব্য ছিল সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেহেতু সরকার গঠনের পর প্রধান সরকারি দল হিসেবে কিভাবে এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছে এবং এক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে তা নিরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে না। তবে সরকার গঠন না করলেও প্রধান বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারের পাশাপাশি সংসদে বিরোধী দল হিসেবে (যেমন বিভিন্ন আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে (যেমন দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতায়ন) কিভাবে ভূমিকা রাখছে তাও পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, এবং এর মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

এই গবেষণা মূলত গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ-নির্ভর। এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে

* ২০১১ সালের ১৮ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত। গবেষণা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র ফেলো শাহজাদা এম আকরাম, ফেলো সাধন কুমার দাস, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো ফাতেমা আফরোজ ও রুমানা শারমিন।

নির্বাচনী ইশতেহার, সরকারি নথিপত্র ও গেজেট, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র এবং ওয়েবসাইট। প্রধান সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সহায়ক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে ১২টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়, এবং সেসব ক্ষেত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে এই তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়। পরবর্তীতে এসব তথ্য নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিত্তিতে সন্নিবেশিত ও উপস্থাপিত হয়। এই প্রতিবেদনে ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১১ এর জুলাই পর্যন্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২. গবেষণার ফলাফল

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট জয়লাভ করে, এবং আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। নির্বাচনের পর নতুন সরকার প্রথম বছরে বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধি ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। তবে একইসাথে নতুন সরকারকে বিভিন্ন জাতীয় সংকট যেমন বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহ ও ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'সহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, এবং সরকারি দলের সমর্থক সংগঠনগুলোর টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল-সন্ত্রাস ইত্যাদি ছিল নতুন সরকারের জন্য চলমান চ্যালেঞ্জ। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল এবং বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়াই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সম্পন্ন করা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বচ্ছতার অভাব, বড় কয়েকটি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে স্থানীয় জনগণের সাথে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি, মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি, এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে ব্যর্থতার কারণেও সরকার সমালোচিত হয়।

২.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দেওয়া, এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় তার মধ্যে দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির অভিযোগকারীর নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ, অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের পর্যালোচনা (Peer Review) ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যালোচনা (Parallel Review), দুদকের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ, এবং দুদকে উপ-পরিচালক, সরকারী পরিচালক এবং উপ-সহকারী পরিচালকের বিভিন্ন পদে প্রায় ৮০ জন নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি চাকুরেদের সম্পদ বিবরণী দাখিল, যাচাই ও সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে সরকার নেতিবাচক কিছু পদক্ষেপ নেয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দুদক আইন ২০০৪' এর সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন। দুদক আইন ২০০৪ সংশোধন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা কয়েকটি সংশোধনের সুপারিশ করে। দুদক আইন সংশোধনের যেসব উদ্যোগ প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত হলে দুর্নীতি দমনে দুদকের ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যাবে। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ছাড়া দুদকের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা দেখা যায় না। এছাড়াও সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা খারিজ, এবং ২০০৯-১০, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ তিন অর্থবছরেই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখা দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয় নির্বাচনী ইশতেহারে।

নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত ১২২টির মধ্যে ৪০টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার জন্য সংসদে উত্থাপন করা হয়। প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো (৪৮টি) স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সংসদে নোটিশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন, এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের সময় নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার

প্রবর্তন করা হয়। 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০০৯' বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপন করা হয়। এছাড়াও 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল চালু করা হয় যা অষ্টম অধিবেশন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে।

তবে এসব ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও নবম সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, কোরাম সংকট, দলীয় নেতৃত্বের প্রশংসা ও প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা অব্যাহত ছিল। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যের ভিন্নমত প্রকাশের জন্য সহায়ক কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চাইতে ভিন্ন বিষয় নিয়ে কোনো কোনো স্থায়ী কমিটি সময় ব্যয় করে। স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সদস্যদের কয়েকটি স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান বিল, ২০১০' ও 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১' ছাড়া সংসদে উত্থাপিত কোনো বিলের খসড়া প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে সাধারণ আলোচনা হয়নি।

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যেসব ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন, বিচার বিভাগের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, নিম্ন আদালতে ২০৭ জন এবং হাইকোর্টে ৪৫ জন বিচারক নিয়োগ, দুই বছরে নিম্ন আদালতে ১৭ লাখের বেশি মামলার নিষ্পত্তি, বৃহত্তর ১৯ জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ এবং ২৭ জেলায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ। এছাড়াও উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যার ফলে ২০১০ এর অক্টোবর থেকে ২০১১ এর ১২ মে পর্যন্ত ৯২,০৬১ মামলার নিষ্পত্তি হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় প্রকাশ এবং পাঁচ জনের ফাঁসি কার্যকর, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগ, এবং ১৯৭১ এর পর থেকে দায়েরকৃত সব 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' মামলা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ ছিল অন্যান্য ইতিবাচক উদ্যোগ।

তবে দেখা যায় নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ থেকে শুরু করে বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এছাড়া নিম্ন আদালতের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিচার বিভাগে নানাবিধ অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখনো উচ্চ এবং নিম্ন আদালতে বিচারক সংকট রয়েছে। বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার অঙ্গীকার করা হলেও তা অব্যাহত রয়েছে। আড়াই বছরে কারা হেফাজতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ৬১২ জনের মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বলে ডাকাতি, হত্যা ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের কারণেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা ব্যাহত হচ্ছে।

৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী ইশতেহারে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা, মন্ত্রীসভার সব সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা, এবং প্রতি দফতরে নাগরিক সনদ উপস্থাপন করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

এক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন, ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু, ই-তথ্যকোষ চালু, এবং তথ্য সরবরাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ৯,৭৮০ জনকে (সরকারি ৭,৫৪২, বেসরকারি ২,২৩৮) নিয়োগ উল্লেখযোগ্য। তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা সব সংসদ সদস্যের সম্পদের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আয়কর বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এবং মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রধান বিচারপতিসহ মোট ১৯ জন বিচারপতি সম্পদের হিসাব দাখিল করেন। বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়াও হয়রানি রোধ করতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পরপর তিনবার সমন জারির পর সাড়া না পেলে তারপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার বিধান করা হয়।

তবে এর পাশাপাশি তথ্য কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগে শ্লথগতি, প্রস্তাবিত জনবল ও অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত না করা প্রভৃতি সীমাবদ্ধতার কারণে কমিশন কার্যকর হচ্ছে না। মন্ত্রীসভার সব সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মন্ত্রিপরিষদ, উপদেষ্টা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর

কাছে জমা দেওয়া সংক্রান্ত নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি, এবং এসব তথ্য প্রকাশ করা হবে কিনা তা প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে। দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বাতিল ও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িক সময়ের জন্য বাতিল করার জন্য সরকারের সমালোচনা হয়।

৫. প্রশাসনের সংস্কার

ইশতেহারে দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা, যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা, প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভর্নেন্স চালু করা, এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

প্রশাসনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১০' এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়। এছাড়াও নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদের ৫০% পূরণে সরকারি কর্ম-কমিশনকে সুপারিশের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এবং সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট শূন্য পদের ৯০% পর্যন্ত নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে প্রশাসন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন খাত যেমন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল বেতনের ওপর গড়ে ৫২% হারে বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়, এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে এসব ইতিবাচক উদ্যোগের বিপরীতে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের দলীয়করণ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অনিয়ম, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮ মাসে ৯,০৯৫টি পদের জন্য নিয়োগ বা চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত করা হয়। পদোন্নতিতে রাজনৈতিক বিবেচনা, রাজনৈতিক বিবেচনায় ওএসডি করা, এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়নি, বরং কর ন্যায়পাল পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত স্থায়ী বেতন কমিশন ও স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠিত হয়নি। প্রশাসনের কম্পিউটারায়নে প্রয়োজনীয় গতির অভাব লক্ষ করা যায়।

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ

আওয়ামী লীগ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করে।

এর মধ্যে সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। ৩২,০০০ পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যার মধ্যে ১৩,৩৯১ পুলিশ নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এবং ৬৭৩টি প্রথম শ্রেণীর পদ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিবিআই) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত একজন ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হয়। ট্রাফিক পুলিশের জন্য বেসিকের ৩০% ভাতা ঘোষণা দেওয়া হয়। সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একই রেশনিং ব্যবস্থা, এবং মামলার তদন্ত করার জন্য 'তদন্ত ভাতা' ও 'ঝুঁকি ভাতা' প্রচলন করা হয়েছে।

তবে এখনও পর্যন্ত বর্তমানে কার্যকর 'পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১' হালনাগাদ ও সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'পুলিশ অর্ডিন্যান্স ২০০৭' চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়নি। হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি এবং টেন্ডারবাজির মতো মারাত্মক অপরাধ অব্যাহত রয়েছে। এখনো পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। সরকারি দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত হওয়া এবং তা প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা সরকারের অন্যান্য অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে।

৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, পরিকল্পিত পল্লী জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে অঙ্গীকার করে।

এসব প্রতিশ্রুতি পূরণে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। সাতটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে দেওয়া হয়, এবং দশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপজেলা পরিষদের অধীনে দেওয়া হয়। এছাড়াও সরকার পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করে - ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ, ২৬২টি পৌরসভায় নির্বাচন ও ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কথা বললেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্থানীয় সরকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রথম অধিবেশনের মধ্যে পাস না করায় কমিশন বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন দ্রুত অনুষ্ঠানের জন্য এ সংক্রান্ত আইন সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। জেলা পরিষদ নির্বাচনেও সরকারের কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত লক্ষ করা যায় না।

৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ

নির্বাচনী ইশতেহারে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়।

'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' এবং 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯' প্রণীত হয়। ফলে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আসে। নিজস্ব জনবল দিয়ে উপ-নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও 'ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০' এর মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে এর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের হাতে না রেখে সরকারের হাতে রাখা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, যা সংশোধিত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' এ অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন এখনো করা হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন উপ-নির্বাচন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী সময় বেশ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো হয়নি।

৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা

মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ।

এক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯' প্রণয়ন এবং এর অধীনে একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা। কমিশনের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করা, এবং ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

তবে সরকার মানবাধিকার কমিশন গঠন করলেও মানবাধিকার কমিশনে জনবল নিয়োগে সরকারি উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা যায়। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা ২০০৯' এবং 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯' অনুমোদন করেনি সরকার। এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা যেমন বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের হয়রানি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আটকদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর নির্যাতন, নারী নির্যাতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব লক্ষ করা যায়।

১০. নারীর ক্ষমতায়ন

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়, যার মধ্যে ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতির পুনর্বহাল, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা, নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া, এবং নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

এর মধ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১' প্রণীত হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নারী মন্ত্রীদের ওপর দেওয়া হয়, এবং প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ ১২টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সদস্যরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন

২০১০' প্রণয়ন করা, নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি, এবং সিডও সনদের আওতায় রিপোর্ট দাখিল করার সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু এবং দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩% করার পরিবর্তে সংশোধিত সংবিধানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বিষয়ক কোনো আইন প্রণীত হয়নি, যেমন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও নারী নির্যাতন অব্যাহত ছিল। নারী নির্যাতন রোধে সরকারের কিছু কিছু উদ্যোগ থাকলেও তা যথেষ্ট ছিল না।

১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা, সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনের অবসান এবং বিশেষ করে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে।

এই ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল সংসদে আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন করা। এছাড়া খাগড়াছড়ি বিচারিক হাকিম আদালত থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আটজন কর্মচারীকে ভূমি কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়।

এর বিপরীতে সংশোধিত সংবিধানে বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙ্গালী অখ্যায়িত করা; আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' ও 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এবং সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে শক্ত অবস্থান নেওয়া হয়। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনে সবগুলো আদিবাসী গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এছাড়াও 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' এর সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। ভূমি কমিশন আইন সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে। এর অংশ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করার কারণে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫৪৬টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করে। সরকারের পক্ষ থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ফর্ম ও আবেদনপত্র সংশোধন, এবং এনজিও ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তবে এনজিওদের সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ খাতের আইন, এনজিওদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পুনর্গঠন, এবং এনজিও ও সরকারের জবাবদিহিতার মাপকাঠি পুনঃনির্ধারণের উদ্যোগ নিলেও তা বর্তমানে এখনো প্রক্রিয়াধীন। এনজিও'দের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সোস্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগের উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক ও যথাযথ তথ্যের অভাবে এটি নিয়ে এনজিও খাতে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

১৩. নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন: প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল – যেমন সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে, এবং সংসদ কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদ সদস্যরা সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করতে পারবে না, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা – এসব কোনোটিই তারা নিজেদের ক্ষেত্রে মেনে চলেনি।

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি ধারাবাহিকভাবে সংসদ বর্জন (৭৪% কার্যদিবস) করে। তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে বিরোধী দলের সদস্যরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্তমান সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেয়নি। এই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে দুদক একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

তবে সম্প্রতি প্রথমবারের মত ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা না দেওয়ার দাবি তুলেছে বিএনপি। এছাড়া এই প্রথম ভারতের সাথে ট্রানজিট ও অন্যান্য চুক্তি প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

১৪. উপসংহার

আওয়ামী লীগের সুশাসন সংক্রান্ত যেসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সূচক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এসব ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম মিশ্র। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশন ও প্রক্রিয়ার সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপ ছিল ইতিবাচক। অন্যদিকে দুর্নীতি দমন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সংসদকে কার্যকর করা, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের সব পদক্ষেপ ইতিবাচক ছিল না। সার্বিকভাবে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সুষ্ঠুভাবে পূরণের পথে এগিয়ে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনো প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি।

ওপরের আলোচনা থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের যে ধারা লক্ষ করা যায় তা হল:

- দুর্নীতি দমনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার পরিবর্তে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন সংসদের স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে একদিকে সংসদ সদস্য অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা; একইসাথে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থ রক্ষা।
- স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে সরকারের নির্বাহী বিভাগ এবং জন-প্রতিনিধিদের লক্ষণীয় অনীহা।
- গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন) প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান সক্ষমতাকে দুর্বল করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা।

১৫. সুপারিশ

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেকগুলোই প্রত্যাশিত পর্যায়ে পূরণ হয়নি বলে ওপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায়। বিশেষকরে যেসব ক্ষেত্রে সরকারের উত্তরণের সুযোগ রয়েছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে –

১. দুর্নীতি দমনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে শুধু এমন সংশোধন আনা উচিত যেন দুদক কার্যকর ও স্বাধীনভাবে, বিশেষকরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার না করে বিচারিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে।

২. সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের সংসদে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র চেয়ারম্যান বিরোধী দল থেকে নিতে হবে, এবং সংসদের দ্বিতীয় ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের আগে বিরোধী দল, জনগণ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো থেকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন সদস্যদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে হবে, এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি সংক্রান্ত বিল দ্রুত আইনে পরিণত করতে হবে।

৩. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪. সংবিধান ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।

৫. সরকারি খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ, এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ওএসডি করে রাখার প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এজন্য সংশোধিত পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে।

৮. মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করার জন্য একে ক্ষমতায়িত করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের আইনের আশ্রয় লাভ নিশ্চিত করা, এবং কারা হেফাজতে মৃত্যু বা নির্যাতন, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

৯. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকারের চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে, এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারীর জন্য বৈষম্যমূলক আইনের সংশোধন করতে হবে।

১০. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করার জন্য এসব জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন এবং তা অনুযায়ী কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে, যেন আদিবাসীদের ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী থাকে।

১১. এনজিও খাতের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন এ খাতের সাফল্য ও স্বকীয়তার ধারা অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ খাতকে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

এক নজরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
১. দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ		
আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি	▪ দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ▪ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ ▪ অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের পর্যালোচনা (Peer Review) ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যালোচনা (Parallel Review) ▪ দুদকের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ▪ উপ-পরিচালক, সরকারী পরিচালক এবং উপ-সহকারী পরিচালকের ৩৮৪টি শূন্য পদের বিপরীতে প্রায় ৮০ জন সহকারী পরিচালক ও উপ-সহকারী পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত	▪ দুদক আইন ২০০৪ সংশোধনের প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন যা বাস্তবায়িত হলে দুদকের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে ▪ দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা না থাকা
সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান	▪ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি চাকুরেদের সম্পদ বিবরণী দাখিল, যাচাই ও সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	▪ সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা প্রত্যাহার ▪ ২০০৯-১০, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ তিন অর্থবছরেই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ অব্যাহত
২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা		
সংসদ কার্যকর করা	▪ সার্বিকভাবে সংসদে গড় উপস্থিতি ৬৬% ▪ নোটিশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন ▪ আলোচনায় অংশগ্রহণের সময় নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ▪ 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল চালু	▪ অধিবেশন কক্ষে সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতি; দেরি করে উপস্থিতির কারণে কোরাম সংকট অব্যাহত ▪ সরকারদলীয় নেতৃত্বের অতি প্রশংসা ও বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার অব্যাহত ▪ বিরোধী দলের সংসদ বর্জন অব্যাহত (৭৪% কার্যদিবস); বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের অভাব ▪ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে সাধারণ আলোচনা না হওয়া
আইন প্রণয়ন	▪ প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত ১২২টির মধ্যে ৪০টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার জন্য উত্থাপন ▪ নয়টি অধিবেশনে ১৪৪টি আইন প্রণয়ন ▪ গুরুত্বপূর্ণ আইন - 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯', 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯', 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০' ▪ 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান বিল, ২০১০' ও 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১' এর খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনমত গ্রহণের জন্য প্রকাশ	▪ বিভিন্ন জন-গুরুত্বপূর্ণ আইন যেমন 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন', 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন ২০০৯', 'শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০০৯' ইত্যাদি প্রণীত হওয়ার আগে জনমত যাচাই না করা
সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার		▪ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যের ভিন্নমত প্রকাশের জন্য সহায়ক কোনো পরিবর্তন না করা

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা	▪ প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো (৪৮টি) স্থায়ী কমিটি গঠন ▪ ১১টি কমিটির কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বৈঠক ▪ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে ৩০টি কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন জমা ▪ কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ	▪ বর্তমান সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চাইতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কোনো কোনো কমিটির সময় ব্যয় ▪ স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সদস্যের স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি
আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন	▪ 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০১০' বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত	
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা		
বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা	▪ অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন ▪ প্রধান বিচারপতিসহ ১৯ জন বিচারপতির সম্পদের বিবরণী দাখিল ▪ বিচার বিভাগের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ▪ নিম্ন আদালতে ২০৭ বিচারক নিয়োগ; হাইকোর্টে ৪৫ জন বিচারক (স্থায়ী ১৩ জন এবং ৩২ জন অতিরিক্ত বিচারক) নিয়োগ; দুই বছরে নিম্ন আদালতে ১৭ লাখের বেশি মামলার নিষ্পত্তি ▪ বৃহত্তর ১৯ জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ এবং ২৭ জেলায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ ▪ উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ ▪ সুপ্রিম কোর্টে জনগণকে তথ্য সরবরাহের জন্য একটি তথ্য সরবরাহ ইউনিট গঠন ▪ ১৯৭১ এর পর থেকে দায়েরকৃত সব 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' মামলা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ	▪ বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন না করা ▪ সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে নিম্ন আদালতের প্রশাসনিক বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব অব্যাহত
বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা		▪ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ▪ আড়াই বছরে কারা হেফাজতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মৃত্যু ৬১২ জনের
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন	▪ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় প্রকাশ এবং পাঁচ জনের ফাঁসি কার্যকর	
যুদ্ধাপরাধের বিচার	▪ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ	
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা		▪ রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বিবেচনা করে ডাকাতি, হত্যা ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ; ১০,২৯৩টির মধ্যে ৬,৬৫৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ ▪ মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা ব্যাহত
৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা		
তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা	▪ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিধিমালা প্রণয়ন; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন ▪ ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু ▪ তথ্য সরবরাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ৯,৭৮০ জনকে (সরকারি ৭,৫৪২, বেসরকারি ২,২৩৮) নিয়োগ ▪ ই-তথ্যকোষ চালু	▪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মৌলিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক না করা
তথ্য কমিশন গঠন	▪ তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন	
প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য ও	▪ নির্বাচন কমিশনে সব সংসদ সদস্যের নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা সম্পদের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ	▪ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সংসদ সদস্যদের সম্পদের বার্ষিক হিসাব প্রকাশ না করা

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস জনসমক্ষে প্রকাশ	▪ প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আয়কর বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ▪ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত	▪ আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া সংক্রান্ত নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি
প্রত্যেক দফতরে নাগরিক সনদ উপস্থাপন	▪ দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ	
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল	▪ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পরপর তিনবার সমন জারির পর সাড়া না পেলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার বিধান	▪ বিতর্কিতভাবে দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ ও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বাতিল ▪ আট দিনের জন্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট 'ফেসবুক' বন্ধ
৫. প্রশাসনের সংস্কার		
দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা	▪ সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১০ এর খসড়া অনুমোদন; নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন; 'নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা-পদোন্নতি) বিধিমালা ২০১১' জারি ▪ প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদের ৫০% পূরণে সরকারি কর্ম-কমিশনকে সুপারিশের ক্ষমতা প্রদান; সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট শূন্য পদের ৯০% পর্যন্ত নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে না বলে সিদ্ধান্ত ▪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে প্রশাসন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিভাগ সৃষ্টি	▪ বিভিন্ন অনিয়ম, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮ মাসে ৯,০৯৫টি পদের জন্য নিয়োগ বা চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত ▪ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত; আড়াই বছরে চুক্তির ভিত্তিতে ২১৫ জনের নিয়োগ ▪ ৮৫১ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি না দেওয়া ▪ রাজনৈতিক কারণে ওএসডি করার প্রবণতা অব্যাহত; দুই বছরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৫৮
সরকারি কর্মকাণ্ডে কম্পিউটারায়ন ও ই-গভার্নেন্স চালু	▪ শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের ই-মেইল অ্যাকাউন্ট, ল্যাপটপ, ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট মডেম ও স্ক্যানার প্রদান এবং ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ ▪ নোটিশ, সার্কুলার ও চিঠিপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো; মাসিক বেতন বিল নির্ধারণের জন্য ডাটাবেজ সফটওয়্যার ব্যবহার ▪ বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ▪ বিভিন্ন খাত, যেমন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ	▪ প্রশাসনের কম্পিউটারায়নে প্রয়োজনীয় গতির অভাব ▪ সরকারি ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ না করা
স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন	▪ মূল বেতনের ওপর গড়ে ৫২% হারে বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা	▪ স্থায়ী বেতন কমিশন গঠিত না হওয়া
স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন	▪ তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত	▪ স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠিত না হওয়া
ন্যায়পাল নিয়োগ		▪ ন্যায়পাল নিয়োগ না করা ▪ কর ন্যায়পাল পদ অবলুপ্ত করা
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ		
পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা	▪ ৩২,০০০ পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত; ১৩,৩৯১ পুলিশ (এর মধ্যে ৬৩২ জন পরিদর্শক) নিয়োগের অনুমোদন; ৬৭৩টি প্রথম শ্রেণীর পদ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত ▪ 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিআইবি) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ ▪ প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত একজন ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি ▪ পুলিশ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য গাড়ি কেনা	▪ 'পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১' হালনাগাদ ও সংশোধন করে তৈরি খসড়া 'পুলিশ আইন ২০০৭' চূড়ান্ত অনুমোদন না করা ▪ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অপরাধ অব্যাহত ▪ সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি ▪ পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
	বাবদ প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ	হস্তক্ষেপ অব্যাহত ▪ পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা
বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি	▪ ট্রাফিক পুলিশের জন্য বেসিকের ৩০% ভাতা (সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা) ঘোষণা ▪ আইজিপি থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একই রেশনিং ব্যবস্থা ▪ মামলার তদন্ত করার জন্য 'তদন্ত ভাতা' ও 'ঝুঁকি ভাতা'	
৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা		
ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	▪ ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ▪ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন ▪ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন ▪ সাতটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে দেওয়া; একইভাবে দশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপজেলা পরিষদের অধীনে দেওয়া	▪ স্থানীয় সরকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রথম অধিবেশনের মধ্যে পাস না করায় কমিশন বিলুপ্ত ▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব আইনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ উপজেলা পরিষদ অকার্যকর করে রাখা ▪ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা
জেলা পরিষদকে উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা		▪ জেলা পরিষদ নির্বাচন না হওয়া
উপজেলা সদরকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা	▪ ২৬২টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত ▪ স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌরসভার অধীনে কাজ করার বিধান ▪ স্থানীয় এলাকার সংসদ সদস্যদের পৌরসভায় উপদেষ্টার পদ ও ডেপুটি মেয়রের পদ বাতিল	
৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ		
নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার	▪ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯ প্রণয়ন; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ▪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতায়ন ▪ নিজস্ব জনবল দিয়ে উপ-নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন	▪ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের হাতে না রেখে সরকারের হাতে রাখা ▪ জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক না করা ▪ রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন না করা ▪ বিভিন্ন উপ-নির্বাচন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ▪ সংশোধিত সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা না বাড়ানো
প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা	▪ ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ	
৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা		
স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন	▪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ প্রণয়ন ▪ কমিশনের চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক ও পাঁচ জন অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ; কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ	▪ মানবাধিকার কমিশনে জনবল নিয়োগে সরকারি উদ্যোগের অভাব ▪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা ২০০৯ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুমোদন না হওয়া
মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করা	▪ ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না	▪ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত - বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের হয়রানি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আটকদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
	করা ▪ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত	নির্যাতন, নারী নির্যাতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে ব্যর্থতা ▪ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব
১০. নারীর ক্ষমতায়ন		
১৯৯৭ সালের 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা	▪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন	▪ নারী উন্নয়ন নীতিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের উল্লেখ না থাকা
প্রশাসনের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগ	▪ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব - স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু; প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ ১২টি মন্ত্রণালয় ▪ সংসদীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ - সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি	
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা		▪ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি না করে মোট সংরক্ষিত আসন ৪৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি করা
নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন	▪ পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ প্রণয়ন; মাতৃসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া বিষয়ক আইন প্রণয়ন ▪ নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি ▪ সিডও সনদের আওতায় রিপোর্ট দাখিল	▪ সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বিষয়ক কোনো আইন প্রণীত না হওয়া ▪ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা	▪ শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া বৈধ ঘোষণা, তবে এর নামে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না বলে রায় ▪ যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনামূলক রায় ▪ নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান ▪ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত; প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ দিয়ে কাউন্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত ▪ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু	▪ নারী নির্যাতন অব্যাহত
১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন		
বৈষম্যমূলক আইনের অবসান	▪ সংসদে আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন	▪ সংশোধিত সংবিধানে বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙ্গালী অখ্যায়িত করা; আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বিতর্ক সৃষ্টি; এ বিষয়ে সরকারের শক্ত অবস্থান ▪ আইনে মাত্র ২৭টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা ▪ 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' এর সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতা
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন	▪ খাগড়াছড়ি বিচারিক হাকিম আদালত থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আটজন কর্মচারীকে ভূমি কমিশনে নিয়োগ ▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার	▪ ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ না নেওয়া; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে জরিপের উদ্যোগ ▪ শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ না করা ▪ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙ্গালী-পাহাড়ী দ্বন্দ্ব অব্যাহত
১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা		
এনজিওদের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	▪ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার	▪ এনজিও'দের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সোস্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ - এর

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
নিশ্চিত করা	জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ▪ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করার কারণে ৫৪৬টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল; ১২ হাজার সংস্থার নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়াধীন ▪ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ▪ বিভিন্ন ফর্ম ও আবেদনপত্র সংশোধনের উদ্যোগ ▪ এনজিও ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা ▪ জঙ্গী অর্থায়নে এনজিওদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ	উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক ও যথাযথ তথ্যের অভাবে এটি নিয়ে এনজিও খাতে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি

এক নজরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

ক্ষেত্র	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির সাপেক্ষে ভূমিকা
দুর্নীতি প্রতিরোধ	▪ দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতির উৎস রুদ্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা ▪ রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ক্রয়-বিক্রয় ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ▪ সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা	▪ ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা না দেওয়ার দাবি ▪ সরকারের দুদক আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
কার্যকর সংসদ	▪ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ▪ সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন ও বিরোধী দলের সদস্যদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা ▪ ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া বৈঠক বর্জন নিষিদ্ধ করা ▪ সংসদ সদস্যরা সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করলে সদস্যপদ বাতিল ▪ স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর দল থেকে পদত্যাগ ▪ বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার করা	▪ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ ▪ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়েই সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় না যাওয়া ▪ ধারাবাহিক সংসদ বর্জন (৭৪% কার্যদিবস); একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ৭৪ কার্যদিবস (প্রায় দশ মাস) পর সংসদে যোগদান
বিচার বিভাগ	▪ বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন ▪ মামলার জট নিরসনের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি পুনর্বিন্যাস ▪ বিচার বিভাগের কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতির সুযোগ নিরসন ▪ অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করা	
তথ্য অধিকার	▪ নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করতে হবে	▪ দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পদের বিবরণী স্বেচ্ছায় প্রকাশ না করা
জনপ্রশাসন	▪ প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ▪ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ▪ প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ▪ প্রশাসনকে সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা ▪ সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য বেতন ও মজুরি কমিশন গঠন	
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	▪ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দমন ▪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সময়োপযোগী ও দক্ষ করে গড়ে তোলা; প্রশিক্ষণ, উন্নত সরঞ্জাম, আধুনিক অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান	
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	▪ প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রিকরণ করা ▪ সকল পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিত করা ▪ স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহাল রেখেই জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করা	▪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের প্রাধান্য নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
নির্বাচন কমিশন	▪ প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করা	
মানবাধিকার	▪ মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন ▪ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত সব আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা জোরদার করা	

ক্ষেত্র	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির সাপেক্ষে ভূমিকা
	▪ মানবাধিকার কমিশনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দান ▪ বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা	
নারীর ক্ষমতায়ন	▪ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে কম সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ▪ নারী পেশাজীবী সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন; নারী পেশাজীবীদের আবাসন ব্যবস্থা ▪ মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ ▪ অ্যাসিড ছোঁড়া আইন দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন ▪ জাতীয় সংসদসহ সকল পর্যায়ে নারীদের অধিক হারে নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি	▪ জাতীয় নারী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী	▪ অনগ্রসর পাহাড়ী ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা; তাদের জন্য চাকরি ও শিক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধা বজায় রেখে জাতীয় উন্নয়নের ধারায় অধিকতর সম্পৃক্ত করা ▪ পার্বত্য জেলায় এবং অন্যান্য স্থানে বসবাসরত উপজাতীয় ও আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা ▪ পার্বত্য অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা	▪ 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার বিষয়ে সরকারের অবস্থান এবং অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থান না নেওয়া
এনজিও খাত	▪ জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশি-বিদেশি এনজিওদের সম্পৃক্ত করা ▪ গৃহহীনদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ ব্যবস্থায় এনজিওদের সহায়তা গ্রহণ	

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিঃ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

১. প্রেক্ষাপট

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের দুর্নীতিবিরোধী এবং সুশাসনের চাহিদার প্রতিফলন দেখা যায় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে।[১] নির্বাচনকে নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা যেমন বেশি ছিল তেমনি দলগুলোও জনগণের প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট[২] এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের[৩] মধ্যে। তবে জোটের মধ্যে থাকলেও সবগুলো প্রধান দল তাদের নিজেদের আলাদা ইশতেহার প্রকাশ করে। জোটের নেতৃত্বে থাকার সুবাদে এর মধ্যে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।

১.১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে পাঁচটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় – দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবিলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, দারিদ্র্য ঘোচানো ও বৈষম্য রোখা, এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা।[৪] আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশকে নিয়ে একটি স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে, যার মূল বক্তব্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য দূর করে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা, এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠন করা। ইশতেহারে আরও বলা হয়, একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হবে যেখানে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা, নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার, জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা ও একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা, এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ, সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ, এবং ই-গভার্নেন্স চালু করার অঙ্গীকার করা হয়। একই উদ্দেশ্যে প্রতি সরকারি দফতরে নাগরিক সনদ উপস্থাপন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন করার কথাও বলা হয়।

১.২ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনী ইশতেহার

বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়। ইশতেহারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বলা হয় আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দমনে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হবে, ধর্মের নামে গঠিত যেকোনো সন্ত্রাসী সংগঠনকে অংকুরেই বিনষ্ট করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করতে সরকারি প্রতিষ্ঠান, জনগণ ও মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন ও বিরোধী দলের সদস্যদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সংসদ সদস্যরা সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করতে পারবে না – করলে সদস্যপদ বাতিল হবে, স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর দলের সাথে কোনো

---

[১] নির্বাচনী সংস্কৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যা নির্বাচনী ইশতেহার নামে পরিচিত। আর জনগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহার যাচাই বাছাই বা পর্যালোচনা করে নির্দিষ্ট দলের পক্ষে তাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

[২] মহাজোটের প্রধান দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, এবং লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

[৩] চারদলীয় জোটের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্য জোট এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)।

[৪] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*।

সম্পর্ক থাকবে না, এবং বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার করা হবে বলে ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, বিচার বিভাগের দুর্নীতি দূর করা এবং একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করার কথা বলা হয়। এছাড়াও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং প্রশাসনকে সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।[৫]

২. গবেষণার যৌক্তিকতা

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সরকার গঠন করে। সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রতি বছরের শুরুতে কয়েকটি সংবাদপত্র জনমত জরিপ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যায়ন ও সমর্থনের হ্রাস-বৃদ্ধি তুলে ধরে,[৬] এবং বর্তমান সরকারের দুই বছরের মেয়াদ শেষে একটি নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের ওপর একটি প্রতিবেদন[৭] প্রকাশ করে। তবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের কোনো গবেষণা-ভিত্তিক উদ্যোগ দেখা যায়নি।

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দেখা যায় বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে না বা তারা অংশগ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে সরকার গঠনকারী দলেরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকে। যেহেতু প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বক্তব্য ছিল সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেহেতু সরকার গঠনের পর সরকারি দল কিভাবে এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছে এবং এক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে তা নিরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে সরকার গঠন না করলেও প্রধান বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারের পাশাপাশি সংসদে বিরোধী দল হিসেবে (যেমন বিভিন্ন আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে (যেমন দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতায়ন) কিভাবে ভূমিকা রাখছে তাও পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে নবম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১১ এর জুলাই পর্যন্ত সরকারি ও বিরোধী দল সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে এই গবেষণার মাধ্যমে তার একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে, যদিও যুক্তিসঙ্গত কারণে সরকারি দলের প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনার ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, এবং এর মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা মূলত গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ-নির্ভর। এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন আইন ও সংসদ বিষয়ক, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের নিয়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বিরোধী দলের নির্বাচনী ইশতেহার, সংসদীয় কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধির গেজেট (খসড়া, চূড়ান্ত), সরকারি নথিপত্র ও গেজেট, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র এবং ওয়েবসাইট।

এই গবেষণায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সহায়ক ১২টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়, এবং এসব ক্ষেত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে এই তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়। এসব তথ্য নির্দিষ্ট কাঠামোতে সন্নিবেশিত হয়। এখানে বর্তমান সরকার ২০০৯ এর জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে শুরু করে ২০১১ এর জুলাই পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

---

[৫] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, *বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও*।

[৬] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৈনিক প্রথম আলোর জনমত জরিপ এবং ডেইলি স্টার-এসি নিয়েলসনের জনমত জরিপ।

[৭] সুশাসনের জন্য নাগরিক - সুজন 'দিনবদলের সনদের অঙ্গীকার ও বাস্তবতা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি।

৫. গবেষণার আওতা

গবেষণার উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকারের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ১২টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়, যার ওপর অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ১২টি ক্ষেত্র হচ্ছে:

১. দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা
৫. প্রশাসনের সংস্কার
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ
৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ
৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা
১০. নারীর ক্ষমতায়ন
১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন
১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

৬. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. গবেষণায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে শুধুমাত্র সরাসরি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত ১২টি ক্ষেত্রের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ইশতেহারে অন্যান্য অনেক খাতে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করা হলেও এবং এসব ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থিত থাকলেও এসব বিষয়ভিত্তিক খাতকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
২. গবেষণার আরেকটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে হালনাগাদ তথ্য না পাওয়া। এর ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।
৩. গবেষণার প্রাথমিক ও পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেকগুলো মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্কার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবের কারণে (প্রকাশিত হয়নি বা মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি) এই প্রতিবেদনে সরকারের কোনো কোনো উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত না-ও হয়ে থাকতে পারে।

৭. গবেষণার ফলাফল

নির্বাচনের পর সরকার প্রথম দুই বছরে কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। এর মধ্যে কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সংকটের মধ্যেও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।[৮] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, শিক্ষা নীতি, ও স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী খাতে সরকার ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে সফল। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন করে পাঁচ জনের ফাঁসি কার্যকর করা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা সরকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঢাকার জন্য প্রযোজ্য ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ, এবং দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতির তথ্য প্রদান সুরক্ষা আইন প্রণয়ন সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ।

অন্যদিকে সরকারকে দুই বছরে বিভিন্ন জাতীয় সংকট মোকাবেলা করতে হয়। সরকার গঠনের স্বল্প সময়ের মধ্যে ২০০৯ এর ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহ যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৭ জন উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা নিহত হন।[৯] বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহের কারণে সৃষ্ট সংকট প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সফলভাবে মোকাবেলা করে সরকার। ২০০৯ এর ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'র কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের ১১টি জেলায় ১৯০ জন মানুষের মৃত্যু হয়, ৩.২৩ লাখ একর ফসলি জমি বিনষ্ট হয়, প্রায় চার লাখ মানুষ গৃহহীন হয়, এবং প্রায় ১,৭৪২ কি.মি.

[৮] উল্লেখ্য, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদেশ থেকে প্রবাসী-আয় আসে ৯৬৮ কোটি ৯০ লাখ ডলার, এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল এক হাজার ৯৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার যা আগের অর্থবছরের চাইতে ১৩.৮% বেশি (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১০)। তবে ২০১০-১১ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার ১৬৫ কোটি ডলার যা এর আগের অর্থবছরের তুলনায় ৬.৩% বেশি (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ জুলাই ২০১১)।

[৯] *ডেইলি স্টার*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

উপকূলীয় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১০] বিডিআর বিদ্রোহ মোকাবেলা করতে পারলেও আইলা-পরবর্তী পুনর্বাসন এবং বাঁধ পুনর্নির্মাণে সরকারের দীর্ঘসূত্রতার কারণে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

যেসব ক্ষেত্রে সরকারকে সমালোচিত হতে হয় তার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি ক্রয়নীতি শিথিল করা, শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ খাতে ইনডেমনিটি, ডিটেল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) বাস্তবায়নে শ্লথগতি, এবং আওয়ামী লীগ ও এর অনুসারী সংগঠনগুলোর টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল-সন্ত্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির কারণে সরকার সমালোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল এবং বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়াই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সম্পন্ন করা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (কনোকো-ফিলিপস, এশিয়া এনার্জি, ট্রানজিট) স্বচ্ছতার অভাব, বড় কয়েকটি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে স্থানীয় জনগণের অধিকার হরণ ও সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি (রূপগঞ্জ, আড়িয়ল বিল, বড়পুকুরিয়া), মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি, এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে ব্যর্থতার কারণেও সরকার সমালোচিত হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ১২টি ক্ষেত্রের ওপর প্রধান সরকারি দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিচে বিশ্লেষণ করা হল। প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতির একটি সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে এই অংশের পরে।

৭.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন ছিল এদেশের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি যার প্রেক্ষিতে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে বিলুপ্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়।[১১] তবে গঠিত হওয়ার পর থেকেই একদিকে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও বিতর্কিত কমিশনার নিয়োগ, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা এবং প্রায়োগিক ক্ষমতার অভাবে কমিশন কার্যকর ছিল না। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' সংশোধন করে নতুন বিধিমালা[১২] প্রণয়ন করে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং অন্যান্যের ধারাবাহিক দাবি ও প্রচারণার ফলে বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ এর ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষর করে। এই সনদ বাস্তবায়নে সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে সনদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আইনগুলোর সাযুজ্য ও পার্থক্য অনুসন্ধান করা, কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ, সনদ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনে আইন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান, ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আইন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকে দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নবম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দুর্নীতি দমন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, এবং প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমনকে অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল অন্যতম।[১৩] বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শীর্ষ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে[১৪] নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বিভিন্ন সময় সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরাও একই আশ্বাস দেন। ২০০৯ সালের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার সরকারের কঠোর অবস্থানের বিষয়টি পুনরায় তুলে ধরেন।[১৫] দোহায় জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সময় আইনমন্ত্রী সনদের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণ সমর্থন করে বলে উল্লেখ করেন।[১৬]

---

[১০] মু. জাকির হোসেন খান ও মনজুর-ই-খোদা, 'আইলা উপদ্রুত অঞ্চলে বাঁধ: ব্যবস্থাপনা ও পুনর্নির্মাণে চাই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা', টিআইবি, ২০১০।

[১১] *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪* এর ৩ (১) ধারার অধীনে।

[১২] *সংশোধিত দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭*।

[১৩] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। এ প্রসঙ্গে নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়, "দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দিতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ... (প্যারা ২)।"

[১৪] জাতীয় সংসদে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)।

[১৫] *ডেইলি স্টার*, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৯।

[১৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ নভেম্বর ২০০৯।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়; যথা নিয়মে ২০১১ এর জুন মাসে বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন জাতিসংঘের কাছে পেশ, এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পর্যালোচনা (Peer Review) ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যালোচনা (Parallel Review) হয়, যাতে সরকার যথোপযুক্ত সহায়তা করে।[১৭] এছাড়া ইতোমধ্যে সনদ বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও তার সাথে সম্পূরক 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১' (Whistleblower Protection Act) প্রণীত হয়েছে, এবং জনপ্রশাসন আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

৭.১.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা

দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ছিল সমালোচিত। নবম সংসদ শুরুর প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী একদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুদক কর্তৃক "ঝাঁকুনির প্রয়োজন ছিল" এই মর্মে বক্তব্য দেন,[১৮] অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে পরিচালিত দুর্নীতি দমন অভিযানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি রাজনীতি দমনের কাজে দুদককে ব্যবহার করা এবং রাজনীতিকদেরকে হয়রানি ও নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং দুদক পুনর্গঠনের ঘোষণা দেন যার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে বলে উল্লেখ করেন।[১৯] সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুদকের কার্যক্রম ও তৎকালীন চেয়ারম্যানের ভূমিকা নিয়ে সংসদে ব্যাপক সমালোচনা হয়।[২০] ২০০৯ এর ২ এপ্রিল দুদকের চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পুনর্গঠিত দুদকের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহিতার লক্ষ্যে এর তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে সংসদীয় কমিটির সামনে তলব করে।[২১] কিন্তু দুদক সংসদীয় কমিটির এ ধরনের নোটিশ প্রদানের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এবং দুদকের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সংসদীয় কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। এরপর সংসদীয় কমিটি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংসদ অবমাননার অভিযোগ আনে। ২০০৯ সালের ২৪ জুন দুদকের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কাজে যোগ দিয়ে নতুন চেয়ারম্যান জানান দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুদক আপোস করবে না এবং সরকারের দিক থেকেও তার ওপর কোনো ধরনের চাপ নেই। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তার বক্তব্যে দুদকের ওপর সরকারের চাপের কথা প্রকাশ পায়।[২২]

ক্ষমতা গ্রহণের পর সংসদে ও তার বাইরে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়সহ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুদকের কার্যক্রমের ব্যাপক সমালোচনা হয়, যার প্রেক্ষিতে দুদক আইন সংশোধন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি কয়েক দফা বৈঠক শেষে কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব করে। প্রস্তাবগুলো গৃহীত হলে দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকরতা খর্ব হবে বলে গণ-মাধ্যম, সুশীল সমাজ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞসহ স্টেকহোল্ডার পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়।[২৩]

২০১০ এর ২৬ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের সভায় 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' এর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর টিআইবিসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রতিবাদ ও দেশব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচির[২৪] পর তিনজন মন্ত্রীর সমন্বয়ে বিষয়গুলো

---

[১৭] জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে সনদের অধ্যায় তিন (অপরাধ নির্ধারণ ও আইনের প্রযোগ) এবং অধ্যায় চার (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) এর ওপর কম্প্রিহেনসিভ সেলফ অ্যাসেসমেন্টের পূরণকৃত চেকলিস্ট ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি)-কে জমা দেয় যা বর্তমানে ইউএনওডিসি এর ওয়েবসাইটে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। একই সময়ে দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশে আসে ইরান ও পেরুর বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া সনদ পর্যালোচনার অংশ হিসেবে প্যারালাল রিভিউ করে টিআইবি।

[১৮] ২০০৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)।

[১৯] জাতীয় সংসদ অধিবেশনের ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখের সম্প্রচার থেকে প্রাপ্ত।

[২০] জাতীয় সংসদ অধিবেশনের ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখের সম্প্রচার থেকে প্রাপ্ত।

[২১] *দৈনিক সমকাল*, ৯ এপ্রিল ২০০৯।

[২২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ অক্টোবর ২০০৯। ১৪ অক্টোবর একটি সংবাদ সম্মেলনে দুদকের চেয়ারম্যান বলেন, "দুদক এমনিতেই দন্তহীন বাঘ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে থাবা দিয়ে দুদক কাজ করত, থাবার সেই নখগুলোও এখন কেটে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।" সরকারের দুদক আইন সংশোধনের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে তিনি এই মন্তব্য করেন।

[২৩] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: টিআইবি, 'মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনী প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি', ২০১১ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থাপিত পজিশন-পত্র।

[২৪] এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল ঢাকাসহ দেশব্যাপি মানব-বন্ধন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, মুঠোফোনে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো এবং অনলাইনে আবেদন সংগ্রহ। ২০১০ এর ১-৫ জুলাই টিআইবি'র দেশব্যাপি পরিচালিত এক জনমত জরিপে প্রায় ৯৭% উত্তরদাতা দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি স্বাধীন ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করে। ৭০% উত্তরাদাতা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রস্তাবের বিপক্ষে মতামত দেয়। সরকারের প্রস্তাবিত অন্যান্য সংশোধনী জনগণ সমর্থন করে না বলেও জরিপে সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন টিআইবি, 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ সংশোধন প্রস্তাবনার ওপর জনমত জরিপ', ২৯ জুলাই ২০১০।

পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি করা হয়। কিন্তু দুদক বা অন্য কোনো স্টেকহোল্ডারকে কোনোভাবে সম্পৃক্ত না করেই উল্লিখিত সংশোধনী আবার অনুমোদন করা হয়। এসব সংশোধনী ২০১১ সালের ২৪ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হওয়ার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী 'দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১১' সংসদে উত্থাপন করেন।

এ বিলটি আইনে পরিণত হলে দুদকের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্ব হবে বলে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে সরকারের পক্ষ থেকে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে কমিশনের সব কাজে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আইনগতভাবে দুদক সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, এবং দুদকের ক্ষমতা খর্ব হবে যা সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষজ্ঞরা আরও মনে করেন আইনটি পাস হওয়ার আগে জনমত যাচাই করা প্রয়োজন।[২৫] বিলটি বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে রয়েছে।

দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। ২০১১ এর ২৪ ফেব্রুয়ারি দুদকের দুইজন কমিশনারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর একটি বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৩ মার্চ দুইজন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৬] অন্যদিকে দুদক'কে কার্যকর করতে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের খুব বেশি তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। দুদকের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। উপ-পরিচালক, সরকারী পরিচালক এবং উপ-সহকারী পরিচালকের ৩৮৪টি শূন্য পদের বিপরীতে প্রায় ৮০ জন সহকারী পরিচালক ও উপ-সহকারী পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত। উল্লেখ্য, দুদকের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সময় থেকে বহাল আছেন, যাদের কর্ম-ইতিহাস যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঢালাওভাবে দুদকে আত্তীকরণ করা হয়। এর ফলে দুদকের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আসছে।[২৭] সম্প্রতি দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। দুদক ছাড়াও একটি গোয়েন্দা সংস্থা কমিশনের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করছে। দুর্নীতির ঘটনা অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে আর্থিক সুবিধা চাওয়া এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসের সূত্র ধরে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং জনগণকে হয়রানির অভিযোগের তদন্ত শেষে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ঠেকাতে বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করে দুদক।

৭.১.২ দুর্নীতি দমনে সরকারের অবস্থান

আইন প্রণয়ন: দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯' প্রণয়নের পাশাপাশি সরকারের উল্লেখযোগ্য একটি ইতিবাচক উদ্যোগ হচ্ছে কোনো দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্যদাতার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন। ২০১০ এর ২২ সেপ্টেম্বর সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান বিল, ২০১০' উত্থাপিত হয় এবং ২০১১ এর ৬ জুন নবম অধিবেশনে এটি আইন হিসেবে সংসদে পাস হয়। উল্লেখ্য, দুর্নীতি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের তথ্য বা সংবাদ সরবরাহকারীকে সুরক্ষা প্রদানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এ বিলটি। বিলে উল্লেখ করা হয়েছে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশকারীর সম্মতি ছাড়া তার পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না, এবং তথ্য প্রকাশকারী চাকরিজীবী হলে তাকে পদাবনত, হয়রানিমূলক বদলি বা বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া যাবে না - এমনকি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা বা বৈষম্যমূলক আচরণও করা যাবে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদকের পক্ষে ব্যাংক বা রাজস্ব বোর্ড থেকে যে কোনো ব্যক্তির তথ্য পাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে গিয়ে এনবিআর, ব্যাংক, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে কোনো ধরনের সহায়তা পাচ্ছে না দুদক। এমনকি কারও সম্পদের হিসাব চেয়ে নোটিশ দেওয়ার আগে তার সম্পদের তথ্য হাতে রাখার জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজও চালাতে পারেনি। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক আয়কর সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট আয়কর আইন সংশোধন করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন তা সরকারের দিক থেকে দেখা যায়নি।

মামলা প্রত্যাহার: বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এখন পর্যন্ত আইনগতভাবে দুদকের স্বাধীনতা থাকলেও বাস্তবিক অর্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। দেখা যায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারি দলের নেতাদের মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে, যদিও মামলা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই বলে জানান।[২৮] অন্যদিকে আইন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কমিটি সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে

---

[২৫] ২০১১ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি টিআইবি আয়োজিত 'মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনী প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তাদের মতামত অনুসারে।

[২৬] তথ্যসূত্র: দুদক সচিবালয়, ১৩ মার্চ ২০১১। নবনিযুক্ত দুইজন কমিশনার হচ্ছেন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক মো. বদিউজ্জামান ও সাবেক জেলা জজ মো. শাহাবুদ্দিন।

[২৭] ইফতেখারুজ্জামান, 'মেকিং দি অ্যান্টিকরাপশন কমিশন ইফেক্টিভ: হোয়াই অ্যান্ড হাও', ২০০৯ এর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত।

[২৮] *দৈনিক সমকাল*, ১২ নভেম্বর ২০০৯। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে টিআইবি আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

দুদকের করা ৩৪০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে দুদকে পাঠায়।[২৯] প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৫টি মামলাও এই তালিকায় ছিল যার সবগুলো প্রত্যাহার করা হয়।[৩০] এখানে উল্লেখ্য, দুদকের মামলা একমাত্র দুদকই প্রত্যাহার করতে পারে।[৩১] এ কারণে চারদলীয় জোট সরকার এবং বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুদকের করা মামলাগুলো প্রত্যাহারের জন্য দুদকে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুদক সরকারি দলের নেতাদের মামলাসহ প্রায় এক হাজার মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় যার অর্থ দুদক মামলাগুলো নিয়ে আর এগোবে না। অন্যদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির নতুন মামলা[৩২] দায়ের করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জরুরি অবস্থায় দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হয়নি, বরং পুরনো মামলাগুলো সচল করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিরোধীদলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না বলে বিরোধীদলীয় মহাসচিব অভিযোগ করেন।[৩৩] একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ১৯৯২ সালের মে মাসে করা একটি দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কমিটি।[৩৪] উল্লেখ্য এই কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১০,৫৩৬টি মামলার মধ্যে ৬,৯৮২টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে।[৩৫] এর মধ্যে দুইটি মামলা বিএনপি'র নেতার বিরুদ্ধে, একটি জাতীয় পার্টির নেতার বিরুদ্ধে, একটি আইনজীবীর বিরুদ্ধে, পাঁচটি প্রশিকার বিরুদ্ধে এবং অবশিষ্ট সবগুলো আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা।[৩৬]

দুর্নীতির মামলা দায়ের ও অন্যান্য উদ্যোগ: বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দুদক দুই বছরে ৪৬২টি মামলা দায়ের করে।[৩৭] তবে সার্বিকভাবে দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তিতে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। এখন পর্যন্ত গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দায়ের করা দুর্নীতির মামলাগুলোর মধ্যে কেবল একটি মামলার রায়ে উচ্চ আদালত সরকারি দলের একজন প্রভাবশালী সংসদ সদস্যকে অব্যাহতি দেন,[৩৮] যেখানে ৭০০ এর বেশি মামলা এখনো আদালতে বিচারাধীন।[৩৯] বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দুদক'কে কোনো সরকারি শীর্ষ পর্যায়ের নেতা বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালাতে বা মামলা করতে দেখা যায়নি। তবে সম্প্রতি প্রথমবারের মত দুদক ক্ষমতাসীন দলের একজন সংসদ সদস্য ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের বাইরে প্রায় ৭২ লাখ টাকার সম্পদ অবৈধভাবে অর্জনের কারণে মামলা করে।[৪০] এই দম্পতি ২০০৯ সালে দুদকের দুই দফা নোটিশের প্রেক্ষিতে তাঁদের সম্পদের হিসাব দুদকে দাখিল করেন।

অন্যদিকে দুদক সরকার ও বিরোধী দলের একাধিক সংসদ সদস্য এবং নেতাদের বিরুদ্ধে পাওয়া দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধানে নামে।[৪১] সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের একজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে বেনামে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার সম্পদের হিসাব চেয়ে নোটিশ দেয় দুদক। এছাড়া আরও একাধিক মামলায় বেশ কয়েক জন সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে তলব করা হয়।[৪২]

---

[২৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ মার্চ, ২০১১।

[৩০] এসব মামলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন দুর্নীতি মামলা, নাইকো দুর্নীতি মামলা, নভোথিয়েটার প্রকল্প সংক্রান্ত তিনটি মামলা, মিগ-২৯ ক্রয়সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা, মেঘনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্র দুর্নীতি মামলা, ফ্রিগেট (যুদ্ধজাহাজ) কেনায় দুর্নীতি মামলা এবং বেপজায় পরামর্শক নিয়োগসংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ মে ২০১০)।

[৩১] ১৯৫৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধির ১০(৪) ধারা অনুযায়ী।

[৩২] ভৈরব ব্রিজ নির্মাণে ব্যয় বৃদ্ধিতে এক কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয় (সূত্র: *দৈনিক আমার দেশ*, ২৮ এপ্রিল ২০১০)।

[৩৩] *ইউএনবিকানেক্ট*, ১৯ মে ২০১০, *বিডিনিউজ২৪.কম*, ৩১ মে ২০১০ ।

[৩৪] কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকে এর সভাপতি বলেন জোট সরকারের আমলে এবং তার পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় করা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে কাজ করবে। তথাপি ১৮ বছর আগের মামলা কোন বিবেচনায় প্রত্যারের সুপারিশ করা হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তরে কমিটি এখন আর সময় বিবেচনা করছে না বলা হয়।

[৩৫] *ডেইলি স্টার*, ১৪ মার্চ, ২০১১; *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ জুন ২০১১।

[৩৬] *বাংলাদেশ টুডে*, মার্চ ২, ২০১১।

[৩৭] *ডেইলি স্টার*, ৮ জানুয়ারি, ২০১১। উল্লেখ্য, দুদক জানুয়ারি ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৩৭৩টি সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারি, ৩,৫৪২টি অনুসন্ধান, ১,০৯৬টি নথিভুক্ত, ২,১৮৭টি এফআইআর, ১,৫৭৮টি সিএস এবং ৮২৪টি এফআর করেছে। জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি মামলা ৪৩৪টি, রিট মামলা ৫৪৯টি, ফৌজদারি আপিল মামলা ২৫টি এবং এফএমএটি মামলা একটিসহ মোট ২,০০৯টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৭৭৮টি মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে, ৩৮৩টি মামলায় স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ৪০৪টি মামলায় স্থগিতাদেশ বিদ্যমান রয়েছে (সূত্র: দুদক সচিবালয়, ৯ মার্চ ২০১১)।

[৩৮] এ প্রসঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, "... আদালতের দায়িত্ব ন্যায়বিচার করা, এবং আমি মনে করি ... ন্যায়বিচার পেয়েছেন।" (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ৫ জুলাই ২০১০)

[৩৯] এ প্রসঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান হতাশা প্রকাশ করে বলেন, "দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের যদি শাস্তি দেওয়া না যায় তাহলে দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ সমাজে কোনো প্রভাব ফেলবে না" (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ৮ জানুয়ারি, ২০১১)।

[৪০] *ডেইলি স্টার*, ৫ জুলাই, ২০১১।

[৪১] *দৈনিক যুগান্তর*, ১ অক্টোবর ২০০৯।

[৪২] *দৈনিক মানবজমিন*, ৩০ এপ্রিল ২০১০।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪৩]

দুর্নীতি দমন কমিশন কতিপয় প্রাক্তন বিচারপতির দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে, এবং জামিনজনিত দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে বিচার বিলম্বসহ মামলাভুক্ত জনগণের হয়রানি ও দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধানে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতিকে সদস্য করে ২০১১ এর ২৩ জানুয়ারি একটি কমিটি তৈরি করা হয়।[৪৪] এছাড়া মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি চাকুরেদের সম্পদ বিবরণী দাখিল, যাচাই ও সংরক্ষণের জন্য একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়, এবং চাকুরেদের সম্পত্তি বিষয়ক তথ্য যাচাই ও সম্ভাব্য অস্বাভাবিক আয়ের উৎস চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৪৫] এই উদ্যোগের অধীনে আয়কর রিটার্নের বাইরেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব নেওয়া হবে। এসব হিসাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হবে ও যাচাই করা হবে।

জাতীয় বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া: রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এসব ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দেখা যায় না। ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ এই তিন অর্থবছরের বাজেটেই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়, যা প্রকারান্তরে অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ করে দেয়। এই তিন অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশ ভৌত অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিলের ইস্যুকৃত বন্ডে ১০% কর দিয়ে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়, যার উৎস নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না।[৪৬] ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে যেকোনো ধরনের অপ্রদর্শিত আয় কিছু নতুন শিল্প বা ভৌত অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে ১০% কর দিয়ে বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়।[৪৭] কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহারের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর ফাঁকি দেওয়া হয়।[৪৮] অনুপার্জিত আয় প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না।[৪৯] বিভিন্ন সরকারি সেবাখাতে ঘুষ ও দুর্নীতির পরিমাণ ও মাত্রা বেড়েছে বলে গবেষণায় দেখা যায়।[৫০]

৭.১.৩ *অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ*

দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ পর্যালোচনা করে দেয়া যায় দুর্নীতির অভিযোগকারীর নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অন্যদিকে দুদক আইন সংশোধনের লক্ষ্যে যে বিলটি উত্থপিত হয়েছে তা পাস হলে এবং যেসব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত হলে দুর্নীতি দমনে দুদকের ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যাবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দ্বারা দুদকের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তলব করা, রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা খারিজ ইত্যাদি উদ্যোগের কারণে দুর্নীতি দমনে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য দুদক আইনকে পরিবর্তন করা হচ্ছে যা সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী। এছাড়াও কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত যেমন অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ রাখার বা কর অবকাশের কারণে ঘুষ ও দুর্নীতিকে পুরোপুরি নিরুৎসাহিত করা হয়নি।

---

[৪৩] *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ মে ২০১০।

[৪৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ জানুয়ারি ২০১১।

[৪৫] এই কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ এপ্রিল ২০১১)।

[৪৬] অর্থ মন্ত্রণালয়, *২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা*, এবং *২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা*।

[৪৭] অর্থ মন্ত্রণালয়, *২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা*।

[৪৮] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন মু. জাকির হোসেন খান ও নীনা শামসুন্নাহার, 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ড: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়', টিআইবি, ২০১১।

[৪৯] একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কর ফাঁকি বা আত্মসাতের পরিমাণ প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা, যা মোট জাতীয় আয়ের ২.৮%। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন মু. জাকির হোসেন খান ও নীনা শামসুন্নাহার, *প্রাগুক্ত*।

[৫০] টিআইবি'র 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০' অনুযায়ী ২০০৭ সালের সর্বশেষ জরিপের তুলনায় সার্বিকভাবে দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা বেড়েছে। ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী ৮৪.২% খানা সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে ২০০৭ সালে এ ধরনের খানার হার ছিল ৬৬.৭%। ২০১০ সালে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো বছরে প্রায় ৯,৫৯১.৬ কোটি টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে ২০০৭ সালে খানাগুলো বছরে প্রায় ৫,৪৪৩.৪ কোটি টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন টিআইবি, *সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০*, ২০১১। এছাড়াও গ্লোবাল ইন্টেগ্রিটি পরিচালিত বার্ষিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, www.globalintegrity.org/report/Bangladesh/2010/

সারণি ১: দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি	▪ দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ▪ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ ▪ অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের পর্যালোচনা (Peer Review) ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যালোচনা (Parallel Review) ▪ দুদকের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ▪ উপ-পরিচালক, সরকারী পরিচালক এবং উপ-সহকারী পরিচালকের ৩৮৪টি শূন্য পদের বিপরীতে প্রায় ৮০ জন সহকারী পরিচালক ও উপ-সহকারী পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত	▪ দুদক আইন ২০০৪ সংশোধনের প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন যা বাস্তবায়িত হলে দুদকের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে ▪ দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা না থাকা
সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান	▪ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি চাকুরেদের সম্পদ বিবরণী দাখিল, যাচাই ও সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	▪ সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা প্রত্যাহার ▪ ২০০৯-১০, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ তিন অর্থবছরেই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ অব্যাহত

৭.২ কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দেড় দশকের মধ্যেই কোরাম সংকট, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন, সরকারি দলের সদস্যদের সংসদে আসার প্রতি অনীহা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব, মন্ত্রীদের সংসদে অনুপস্থিতি, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা না হওয়া, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক না হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ আশানুরূপ কার্যকর ছিল না।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার ছিল কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, একটি আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন করা হবে বলে অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ।[৫১]

৭.২.১ *সংসদ কার্যকর করা*

সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ: নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং অষ্টম সংসদের তুলনায় অনেক সক্রিয়ভাবে। প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়, যাতে বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। আগের সংসদগুলোর তুলনায় সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন সম্পন্ন, প্রধান বিরোধী দলের প্রথম অধিবেশনে যোগদান ইত্যাদি ছিল প্রথম অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য দিক।

প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন[৫২] পর্যন্ত মোট ১৬৯ কার্যদিবসে সরকারি দলের ১১% সংসদ সদস্য ৯০% এর বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে ৫০% থেকে ৯০% কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন সরকারি দলের প্রায় ৮০% সংসদ

[৫১] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "... জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে ... রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেয়া হবে (প্যারা ৫.৩)।" "রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা হবে ...। একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে (প্যারা ৫.৪)।" এছাড়াও পরিশিষ্টে বলা হয়, " ... সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ... সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, স্বচ্ছ অর্থায়ন, শিষ্টাচার ও সহনশীল আচরণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা ও অধিকতর সংস্কারের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে" (পরিশিষ্ট, 'সংকটমোচন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগের রূপকল্প (ভিশন ২০২১): ২০২১ সাল নাগাদ কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই')।

[৫২] ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হয় ২০১০ এর ৬ অক্টোবর। সপ্তম ও অষ্টম অধিবেশনের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি (তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়)।

সদস্য।[৫৩] প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ১৭৪ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ১২৬ দিন (মোট কার্যদিবসের প্রায় ৭২.৪%)। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে পাঁচ দিন (প্রায় ২.৯%) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নবম সংসদে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল আগের সংসদগুলোর তুলনায় বেশি। তবে অনেক সংসদ সদস্য অধিবেশন কক্ষে দেরি করে উপস্থিত হন বলে প্রথম দুই বছরের সাতটি অধিবেশনের প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৩৫ মিনিট কোরাম সংকট হয়। মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার পরও কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয়। তবে দেখা যায় যেদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে সেদিন অধিকাংশ সংসদ সদস্য সময়মত সংসদে উপস্থিত হন। সার্বিকভাবে সংসদে গড় উপস্থিতি ছিল ৬৬%।[৫৪]

সংসদে সদস্যদের উপস্থিতি বাড়লেও বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করেন। দেখা যায় একই সদস্য বার বার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, আবার অনেক সদস্য একেবারেই অংশগ্রহণ করেন না। অনেক সময় সংসদ সদস্যরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেন, এমনকি বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে তাদের অনেকে বিরোধী দল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের শাসনের সমালোচনা করেন, যা সংসদের মূল্যবান সময়ের অপচয় হিসেবে ধরা যায়।

আইন প্রণয়ন: সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশগুলো পরবর্তী সংসদের প্রথম অধিবেশনের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে পাস হওয়ার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকার ফলে সেই সময় জারি করা ১২২টি অধ্যাদেশের মধ্য থেকে বাছাই করে ৪০টি অধ্যাদেশ বিল আকারে সংসদের প্রথম অধিবেশনে উত্থাপন করা হয়।

নবম সংসদের নয়টি অধিবেশনে মোট ১৪৪টি আইন প্রণীত হয়। এর মধ্যে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯', 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯', 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০০৯', 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০০৯', 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১০', 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয়। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯' অনুমোদন। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পর সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিল অনুমোদনের মধ্য দিয়ে দেশে বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের জন্য একটি মৌলিক আইন প্রণয়ন করা হয় যার প্রেক্ষিতে তিন মাস পর পর অর্থমন্ত্রী সংসদকে বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত করবেন বলে বিধান রাখা হয়। এছাড়া 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯', 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংশোধন বিল, ২০১০', 'উপজেলা পরিষদ সংশোধন বিল, ২০১০' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদে উত্থাপিত হলেও এখনো আইনে পরিণত হয়নি, যদিও নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে এসব বিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া অনেক বিলে[৫৫] সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়েও অধিবেশনে উপস্থিত না থাকার কারণে সেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি।

নবম সংসদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হল সংসদে নোটিশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন। নোটিশ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য এ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম দুই বছরে সাতটি অধিবেশনে ২৩৬টি জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ গৃহীত হয়, যদিও জমা পড়া নোটিশের মোট সংখ্যা ছিল চার হাজারের বেশি। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দুই বছরে বিভিন্ন দেশ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ৯৯টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়[৫৬] যার কোনোটিই জাতীয় সংসদে আলোচিত হয়নি।[৫৭]

নবম সংসদে আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ 'ককাস' (বিষয়ভিত্তিক দল) গঠন। ২০১০ এর ১০ ফেব্রুয়ারি আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠিত হয়। এছাড়া বর্তমান সরকার 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে নতুন একটি সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল চালু করা হয়েছে যা অষ্টম অধিবেশন থেকে সম্প্রচার শুরু করেছে।

---

[৫৩] উল্লেখ্য, অষ্টম জাতীয় সংসদে ১১৩ জন সংসদ সদস্য ৫০% কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। মাত্র ৭৪ জন সংসদ সদস্য ৭৬% বা এর বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ১০৪ জন সংসদ সদস্য অর্ধেকের বেশি কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে ৪৭ জন ছিলেন সরকারি দলের সংসদ সদস্য। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন তানভীর মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*।

[৫৪] তবে প্রধান বিরোধী দলের বাইরে অন্যান্য বিরোধী দলের মধ্য থেকে একজন স্বতন্ত্র সদস্য (নোয়াখালি ৬) ৬৮% শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সরকারি দলের একজন সদস্য (নীলফামারী ৫) নবম সংসদের দুই বছরের সাতটি অধিবেশনের সবগুলো কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন।

[৫৫] 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিল ২০১০', 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল' ইত্যাদি।

[৫৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

[৫৭] বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিদেশের সাথে সম্পাদিত সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হবে এবং তিনি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। সম্প্রতি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ: যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার আগে এর ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ইত্যাদি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তা নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। নবম সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় বেশিরভাগ বিলের খসড়া গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১' ও 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১' এর খসড়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনমত গ্রহণের জন্য প্রকাশ করা। 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন', 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন ২০০৯', 'শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০০৯' ইত্যাদি প্রণীত হওয়ার আগে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন বা প্রস্তাব থাকলেও তা করা হয়নি। বিলগুলো আইনে প্রণীত হওয়ার আগে জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব বিরোধী দলের সদস্যরা জমা দিলেও অধিবেশনে উপস্থিত না থাকায় তারা সেগুলো উত্থাপন করতে পারেনি। একজন স্বতন্ত্র সদস্য বিল উত্থাপন ও আলোচনার সময় জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তবে প্রতি ক্ষেত্রেই তা কণ্ঠভোটে বাতিল হয়ে যায়।[৫৮]

৭.২.২ সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার

আইনগত দিক থেকে ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার জাতীয় সংসদে রয়েছে, তবে তা বাস্তবিক অর্থে কতটা কার্যকর তা বিবেচনার বিষয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ[৫৯] সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন।[৬০] সরকার কোনো বিষয়ে দেশের বা জনগণের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে একজন সংসদ সদস্যের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব তা বাধা দেওয়া কিন্তু এ অনুচ্ছেদের কারণে নিজ দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে না।

সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি থাকলেও সরকার গঠনের পর থেকে এমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছিল না। সম্প্রতি সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটি শুরুতে সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনের পক্ষে থাকলেও পরবর্তীতে চূড়ান্ত সুপারিশে এই অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করে, যেখানে কোনো দল থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর পদত্যাগ বা ঐ দলের বিপক্ষে সংসদে ভোট দিলে একজন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে।[৬১] সরকারি দলের কয়েকজন প্রবীণ সংসদ সদস্য সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের খোলাখুলি সমালোচনা করলেও অপেক্ষাকৃত নবীন এবং যারা প্রথমবার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের কাছ থেকে ভিন্ন মতামত পাওয়া যায়নি।

৭.২.৩ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংসদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগের কাজের যেমন পর্যালোচনা করে তেমনি প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে বিকল্প নির্দেশ দিতে পারে। এসব কমিটির সাফল্য কমিটি গঠনের সময়, কমিটির বৈঠক সংখ্যা, কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনের সংখ্যা, বৈঠকের সময়সীমা, আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদীয় কমিটিগুলো মন্ত্রীসহ যেকোনো সচিবকে ডাকতে পারে, সাক্ষ্য নিতে পারে কিংবা প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করতে পারে।

সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের মধ্যে কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[৬২] তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো (৪৮টি) কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে অষ্টম সংসদের ক্ষেত্রে লেগেছিল প্রায় দেড় বছর। এছাড়াও কয়েকটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও[৬৩] কমিটি গঠনের পর থেকে প্রথম দুই বছরে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৬টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে কেবল **১১**টি কমিটি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বৈঠক করতে সক্ষম হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৫৭টি বৈঠক করে;

---

[৫৮] মো ফজলুল আজিম, নোয়াখালী ৬ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য *শ্রম আইন (সংশোধন) বিল, ২০০৯*, Supreme Court Judges Remunaration (Amnd) Bill, 2010, ও The Ministers, State Ministers & Deputy Ministers Remunaration (Amnd) Bill 2010 এর ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করেন (সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ৬ নভেম্বর ২০০৯)।

[৫৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ঐ দল থেকে পদত্যাগ করলে বা সংসদে ঐ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। তিনি যদি সংসদে উপস্থিত থেকেও ভোটদানে বিরত থাকেন বা সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তিনি তার দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

[৬০] শাহজাদা আকরাম, সাধন কুমার দাস ও তানভীর মাহমুদ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, টিআইবি, ২০০৯। বিশেষজ্ঞদের মতে দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, বাজেট, গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন, এবং দলের মূল আদর্শের পরিপন্থী এমন বিষয় ছাড়া অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে সংসদ সদস্যদের কথা বলার অধিকার থাকা উচিত।

[৬১] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন *ডেইলি স্টার*, ১ ও ২৯ এপ্রিল ২০১১; *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জুন ২০১১। উল্লেখ্য, কোনো রাজনৈতিক দলই সংসদে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন মতামতের অধিকার দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী ছিল না।

[৬২] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৬ বিধি অনুযায়ী।

[৬৩] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।

বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বনিম্ন ছয়টি বৈঠক করে, এবং তিনটি[৬৪] কমিটি কোনো বৈঠক করেনি। সার্বিকভাবে ৪৮টি কমিটি মোট ৮৮১টি এবং ১০৯টি উপ-কমিটি ৩১৪টি বৈঠক করে।[৬৫] প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কমিটিগুলো এ পর্যন্ত সহস্রাধিক সুপারিশ করেছে। তবে কতগুলো সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে তার হিসাব অধিকাংশ কমিটির কাছে নেই। সংসদের দুই বছর পরেও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর অধিকাংশই বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেয়নি। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে কেবল ১৫টি কমিটি বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।[৬৬]

কোনো কোনো স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম আলোচিত বা সমালোচিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী স্পিকারের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়, এবং পরে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ২০০৯ সালের ১০ জুন সাবেক স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সাবেক চিফ হুইপকে তলব করে। পরবর্তীতে কমিটি সংসদে তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে এবং কণ্ঠভোটের মাধ্যমে সাবেক স্পিকারের সদস্যপদ রক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পুনর্গঠিত দুদকের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার জন্য এর তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে সংসদীয় কমিটির সামনে তলব করে।

কয়েকটি স্থায়ী কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার (conflict of interest) কারণে কমিটির কাজ প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কমিটিতে আর্থিক, প্রত্যক্ষ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে (সংসদ সদস্যকে) কমিটির সদস্য করা যাবে না।[৬৭] অথচ বর্তমান সংসদে অন্তত ২০ জন সদস্য রয়েছেন যারা এ বিধি লঙ্ঘন করে স্থায়ী কমিটির সদস্য হয়েছেন। অর্থ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, যোগাযোগ, নৌ-পরিবহন, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য ইত্যাদি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ক্ষেত্রে এই বিধি পালিত হয়নি।[৬৮]

সম্প্রতি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে দলিলসহ সাক্ষী তলবের ক্ষমতা দিয়ে নতুন আইন করার প্রস্তাব উত্থাপন এবং তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কমিটির বৈঠকে। এই প্রস্তাবনায় সংসদীয় কমিটিকে অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে দেওয়ানি আদালতের (কোড অব সিভিল প্রসিডিউর ১৯০৮) ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ যেকোনো ধরনের নথি বা দলিল উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারির ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সংসদীয় কমিটিকেও একই ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কমিটির তলব অগ্রাহ্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া কিংবা জরিমানা করার সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া সাক্ষী হিসেবে যাকে তলব করা হবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে কমিটির বৈঠকে হাজির হতে হবে; এ ক্ষেত্রে আইনজীবী বা প্রতিনিধির সহযোগিতা নেওয়ার সুযোগ না রাখারও প্রস্তাব করা হয়েছে। 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি (সাক্ষী তলব, দলিল দাখিল) আইন, ২০১১' শীর্ষক আইনের খসড়া এ বছরের ৩১ জানুয়ারি আইন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়।[৬৯] তবে শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব ৩১ মে মন্ত্রিপরিষদের সভায় বাতিল হয়ে যায়।[৭০]

৭.২.৪ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন

নির্বাচনী ইশতেহারে একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য[৭১] জাতীয় সংসদে 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০১০' উত্থাপন করেন। বিলটি উত্থাপনের সময় তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি ছিল তার উল্লেখ করেন। সরকারি উদ্যোগে নয় বলে এটি বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত হয়, যা এখনো আইনে পরিণত হয়নি।

৭.২.৫ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

সংসদ কার্যকর করার জন্য নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সবগুলো সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন, সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি প্রণয়ন করার উদ্যোগ, আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন, 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল শুরু ইত্যাদি বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবে সংসদীয় সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়নি। সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, কোরাম সংকট, দলীয় নেতৃত্বের প্রশংসা ও বিরোধী দলের সমালোচনা অব্যাহত ছিল। সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত

---

[৬৪] বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও পিটিশন কমিটি। উল্লেখ্য, পদাধিকার বলে স্পিকারই এ তিনটি কমিটির সভাপতি।

[৬৫] ৩১ জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত (জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী)।

[৬৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ জানুয়ারি ২০১০।

[৬৭] *কার্যপ্রণালী বিধির* ১৮৮ বিধি অনুযায়ী।

[৬৮] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২ সেপ্টেম্বর ২০১০।

[৬৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

[৭০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ জুন ২০১১।

[৭১] সাবের হোসেন চৌধুরী, ঢাকা ৯ থেকে নির্বাচিত।

প্রকাশের অধিকার রক্ষায় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এ ধরনের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চাইতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কয়েকটি কমিটি বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে। রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়নি।

সারণি ২: কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
সংসদ কার্যকর করা	▪ সার্বিকভাবে সংসদে গড় উপস্থিতি ৬৬% ▪ নোটিশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন ▪ আলোচনায় অংশগ্রহণের সময় নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ▪ 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল চালু	▪ অধিবেশন কক্ষে সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতি; দেরি করে উপস্থিতির কারণে কোরাম সংকট অব্যাহত ▪ সরকারদলীয় নেতৃত্বের অতি প্রশংসা ও বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার অব্যাহত ▪ বিরোধী দলের সংসদ বর্জন অব্যাহত (৭৪% কার্যদিবস); বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের অভাব ▪ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে সাধারণ আলোচনা না হওয়া
আইন প্রণয়ন	▪ প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত ১২২টির মধ্যে ৪০টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার জন্য উত্থাপন ▪ সাতটি অধিবেশনে ১৩৬টি আইন প্রণয়ন ▪ গুরুত্বপূর্ণ আইন - 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯', 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯', 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০' ▪ 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান বিল, ২০১০' ও 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১' এর খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনমত গ্রহণের জন্য প্রকাশ	▪ বিভিন্ন জন-গুরুত্বপূর্ণ আইন যেমন 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন', 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন ২০০৯', 'শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০০৯' ইত্যাদি প্রণীত হওয়ার আগে জনমত যাচাই না করা
সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার		▪ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যের ভিন্নমত প্রকাশের জন্য সহায়ক কোনো পরিবর্তন না করা
সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা	▪ প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো (৪৮টি) স্থায়ী কমিটি গঠন ▪ ১১টি কমিটির কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বৈঠক ▪ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে ৩০টি কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন জমা ▪ কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ	▪ বর্তমান সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চাইতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কোনো কোনো কমিটির সময় ব্যয় ▪ স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সদস্যের স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি
আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন	▪ 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০১০' বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত	

৭.৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে এবং বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।[৭২] ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৭৩] আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মামলা ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব আনার কথা বলেন যা বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ বহুলাংশে কমাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিকল্প বিচার ব্যবস্থা (এডিআর), বিচার বিভাগে দুর্নীতি কমানো, এবং রায়ের কপি পাওয়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার। অন্যদিকে আইন প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব

[৭২] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ... করা হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ... করা হবে (প্যারা ৫.২)।" "যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে" (প্যারা ৫.১)।

[৭৩] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ জানুয়ারি ২০০৯। আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এবং ব্রিটিশ কমিশনারের সাথে এক সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশের বিচার বিভাগ এখন নিজস্ব গতিতে চলবে। সরকার তাতে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না"।

নেওয়ার প্রথম দিনেই তার অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনগণের জন্য সার্বিক সেবা প্রদানে আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান।[৭৪]

বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নেওয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হচ্ছে:

- অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন। সংবিধানের ৯৫(২)গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে অতিরিক্ত যোগ্যতা নির্ধারণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রধান বিচারপতির সম্পদের বিবরণী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রদান; অন্যান্য বিচারপতিদের সম্পদের বিবরণী প্রদানের আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ জন বিচারপতির সম্পদের বিবরণী প্রধান বিচারপতির কাছে দাখিল।
- সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদারি মোশন বেঞ্চে আদেশ প্রদান ও আদেশের পর মামলার নথি শাখায় পুনরায় পাঠানো নিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ থাকায় ফৌজদারি মামলা শুনানির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন। ফৌজদারি মামলা দাখিল এবং এফিডেভিট এর ক্রম অনুযায়ী শুনানির জন্য কার্যতালিকায় মামলা আসবে এমন নিয়ম চালু।
- সুপ্রিম কোর্টে মামলা আদালতে তুলতে এবং আদেশের কপি ও নথি সংশ্লিষ্ট শাখায় না পাঠিয়ে কারসাজি করাসহ বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন আদালতে মামলাজট কমাতে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করার জন্য দেওয়ানি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ; সুপ্রিম কোর্টে মামলা ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-রেজিস্টারিং পদ্ধতি চালু।
- আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আপিল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা সাত থেকে এগারোতে উন্নীত করা; বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৫০টি দেওয়ানি এবং ৪,৯৬৯টি ফৌজদারিসহ মোট ৭,৪৭৬টি মামলা সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি।
- আগাম জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুসৃত ডাইরেকশন প্রথা রহিত করা; সরাসরি জামিন না দিয়ে চার বা ছয় সপ্তাহের মত সময় দিয়ে অভিযুক্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশনা প্রদানকে আপিল বিভাগ কর্তৃক আইন-বহির্ভূত ঘোষণা।
- সুপ্রিম কোর্টে আগত বিচারপ্রার্থীদের কোর্ট প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিচারপতি, উকিল ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন।

৭.৩.১ *বিচার বিভাগ পৃথককরণ*

নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথককরণ রাষ্ট্রের নিশ্চিত করার কথা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে।[৭৫] এছাড়াও সংবিধানে উচ্চ আদালতের সুপারিশক্রমে অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ ও তাদের পদোন্নতির বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে।[৭৬] কিন্তু এর আগের কোনো সরকারই নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। পরপর দুটি রাজনৈতিক সরকার (সপ্তম ও অষ্টম সংসদের মেয়াদে) এবং মধ্যবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়ে ২২ বার সময় চাওয়া হয়। এছাড়া এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ যাচাই করার জন্য সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের আবেদন মুলতবি রাখা হয় ছয় বার। এভাবে মোট ২৮ বার সময় দেওয়ার পর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।[৭৭] গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে ২০০৭ এর ১ নভেম্বর বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয়। এজন্য 'দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ২০০৭', 'জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭', 'জুডিশিয়াল সার্ভিস পে কমিশন বিধিমালা ২০০৭', 'জুডিশিয়াল সার্ভিস (নিয়োগ, প্রত্যাহার, বহিষ্কার প্রভৃতি) বিধিমালা ২০০৭' এবং 'জুডিশিয়াল সার্ভিস (পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং চাকরির শর্তাবলী) বিধিমালা ২০০৭' জারি করা হয়।

এর ধারাবাহিকতায় বিচার বিভাগ পৃথককরণের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন এবং বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৯' অনুমোদন এবং ২১৫ জন সহকারী জজ/ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিচারিক কাজ পেশাদার বিচারকেরাই করেন; প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যরা বিচার কাজে নেই। সুপ্রিম কোর্টের কার্যকর পরামর্শে আইন মন্ত্রণালয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি, কর্মস্থল নির্ধারণ ও শৃঙ্খলা বিধান করে।[৭৮]

---

[৭৪] *ডেইলি স্টার*, ২৬ জানুয়ারি ২০০৯।

[৭৫] *বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২২।

[৭৬] *বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৫-১১৬।

[৭৭] *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১ নভেম্বর ২০০৭।

[৭৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন, Statement regarding the successes attained by the Law and Justice Division of the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs during the tenure of the present democratic government over two years at the website (http://www.minlaw.gov.bd/)

গত চারদলীয় জোট সরকারের সময় তৎকালীন প্রধান বিচারপতির ইতিবাচক সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের শেষ সময়ে দু'বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত দশ জন বিচারপতিকে নিয়োগ-বঞ্চিত রাখা হয়। ২০০৯ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে এই সকল বিচারপতিদের পুনঃনিয়োগের আদেশ দেয়। তবে তাঁরা পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হিসেবে জ্যেষ্ঠতা পাবেন না। এই রায়ের প্রতি উভয় পক্ষের আইনজীবীরা সন্তোষ প্রকাশ করে।[৭৯] এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপনের বিষয়টি এই সরকারের পরিকল্পনায় আছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ৯৮ জন; প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগে আটজন এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৯০ জন।[৮০]

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ জুডিশিয়াল পে-কমিশনের করা সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে দুই মাসের সময় বেঁধে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৯ এর ১২ মে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগের সাত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই আদেশ দেয়। এর ফলে জুডিশিয়াল অফিসারদের জন্য 'পে অ্যান্ড অ্যালাউন্স অর্ডার ২০০৯' এর মাধ্যমে পৃথক বেতন কাঠামো করা হয় যেখানে পূর্ণ মেয়াদকালীন জুডিশিয়াল অফিসারদের জন্য ৩০% বিশেষ ভাতা বরাদ্দ করা হয়। বৃহত্তর ১৯ জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ এবং ২৭ জেলায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় সরকার।[৮১] চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য ১০৩টি গাড়ি ক্রয়, ২৩৬টি কম্পিউটার, ৬৮টি ফটোকপিয়ার এবং ৬৮টি ফ্যাক্স মেশিন কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা, এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বিল্ডিং, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিল্ডিং-কাম-পুলিশ ব্যারাক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে জুডিশিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এ জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জজ হতে জেলা জজ পর্যন্ত মোট ২৪৩ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ঢাকা শহরের কাকরাইলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের জন্য একটি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক কমপ্লেক্স এবং রিক্রেয়শন সেন্টার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৮২] তবে এখনো বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করা হয়নি।

বিচার বিভাগ আলাদা হলেও নিম্ন আদালতের ওপর প্রশাসনের নির্বাহী বিভাগের প্রভাব রয়ে গেছে। সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারা সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অপরাধ আমলে নেওয়ার' ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অধস্তন আদালতগুলো তদারকির জন্য প্রস্তাবিত সচিবালয় এখনো হয়নি। বিচারকদের বেতন-ভাতার বিষয়ে পে-কমিশনকে সহায়তার জন্য গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কারিগরি কমিটির সুপারিশও বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, জনবল ও যানবাহন-ব্যবস্থা পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায়নি। বিচারকদের অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ২০০৯ সালে তা অনুসরণ করা হয়নি।[৮৩] মামলার তারিখ পরিবর্তন কিংবা নথিপত্র সংগ্রহের জন্য ঘুষ দেওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা।[৮৪] এর বাইরেও নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, বিভাগীয় নানা সুবিধা নিয়ে তদবির করা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে জামিন দেওয়া কিংবা না দেওয়া, রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ পাওয়া যায়।[৮৫]

নিম্ন আদালতের ১,২০০ বিচারক দিয়ে ১৬ কোটি মানুষের দেশে সুস্থ বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ। বিভিন্ন জেলায় রয়েছে বিচারক সংকট। উল্লেখ্য, গত সাত বছর ধরে নিম্ন আদালতে ৪০০ বিচারকের পদ খালি আছে যা জনগণের ন্যূনতম বিচারিক সুবিধা পাওয়ার বিষয়কে দারুণভাবে ব্যাহত করছে। বিচারক ও দক্ষ আইনজীবীর সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে আইনমন্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায়।[৮৬] সরকার এখন পর্যন্ত নিম্ন আদালতের জন্য মোট ২০৭ জন বিচারক নিয়োগ করেছে। এছাড়া নিম্ন আদালতের জন্য আরও ১০১ জন সহকারী জজ এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিয়োগ প্রক্রিয়া এক বছরের বেশি সময় পার হলেও এখনো শেষ হয় নি। সম্প্রতি লিখিত পরীক্ষার ফলাফল হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০১০ এর জুন মাসে। নিম্ন আদালতে প্রায় ১৭ লাখ মামলা বিচারাধীন থাকলেও বিচারকের সংখ্যা মাত্র ১,৩০০ জন। মামলার জট কমানোর জন্য সরকারের দিক থেকে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ থাকলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতায় তা সফল হচ্ছে না।

---

[৭৯] *ডেইলি স্টার*, ৩ মার্চ ২০০৯।

[৮০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ মার্চ ২০১১।

[৮১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মে ২০০৯। অ্যাটর্নি জেনারেলের তথ্য অনুযায়ী।

[৮২] bdnews24.com, ১৪ মে ২০১১।

[৮৩] *ডেইলি স্টার*, ৩ আগস্ট ২০০৯।

[৮৪] সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারিক আদালতের জজদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমার কাছে প্রমাণ আছে কর্মচারীদের সাথে আপনারা আর্থিক লেনদেন করে থাকেন। এমনভাবে কাজ করুন যাতে জনগণ বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা ফিরে পায়" (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ নভেম্বর ২০১০)।" টিআইবি'র ২০১০ সালের জাতীয় খানা জরিপে বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির যে চিত্র প্রকাশিত হয় তাতে তার এই বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন টিআইবি, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০*, ঢাকা, ২০১১।

[৮৫] নীতি গবেষণা কেন্দ্র (এনজিকে), 'জুডিশিয়ারি ইন বাংলাদেশ: রিভিউ ২০০৯', ২০১০।

[৮৬] *ডেইলি স্টার*, ৫ মার্চ ২০০৯। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য দেন।

উচ্চ আদালতেও বিচারক সংকটের কারণে বিচারিক সুবিধা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা তিন লাখ তিন হাজার ৩০৩টি, বিচারপতি আছেন ৯৮ জন, একক ও দ্বৈত বেঞ্চ সংখ্যা ৫১টি, এর মধ্যে আটটি বেঞ্চের রিট এখতিয়ার আছে, দেওয়ানি মামলার শুনানির জন্য রয়েছে সাতটি বেঞ্চ। বিচার প্রার্থীদের দুর্ভোগ নিরসনে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১-এ ধারায় মামলার শুনানি, জেল আপিল শুনানি এবং ডেথ রেফারেন্সের (মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণ) জন্য পৃথক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চকে ৫৬১-এ ধারায় ২০০৯ এবং ২০১০ সালের মামলা শুনানিও নিষ্পত্তির এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। জেল আপিল শুনানির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ২৭টি বেঞ্চকে। সংশ্লিষ্ট বেঞ্চকে ১০টি করে মামলা নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হয়েছে। ৫৬১-এ ধারার অধীনে নতুন মামলা শুনানির জন্য ছয়টি বেঞ্চকে, ডেথ রেফারেন্সের জন্য দুটি এবং নতুন ফৌজদারি মামলার জন্য ১০টি বেঞ্চকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন নিষ্পত্তির দিন ধার্য করা হয়েছে। ২০১১ এর জানুয়ারি পর্যন্ত একটি হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ৫ হাজার ২৬০টি এবং হাইকোর্টের তিন লাখ ২৫ হাজার ৫৭১টি মামলা[৮৭] বিচারাধীন ছিল। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, সুপ্রিম কোর্টে ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে এমন বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৮ হাজার ৩৭৬ এবং দশ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে এমন বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৯৫ হাজার ১২১।[৮৮]

সরকার এসব দীর্ঘদিনের জমে থাকা মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের জন্য আরও ৫০ জন বিচারক নিয়োগের পরিকল্পনা করছে। এর অংশ হিসেবে ২০১০ এর ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টে ১৫ জন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকারের দু'বছরের মেয়াদে হাইকোর্টে ৪৫ জন বিচারক (স্থায়ী ১৩ জন এবং ৩২ জন অতিরিক্ত বিচারক) নিয়োগ করা হয়। আপিল বিভাগের বিচারকের সংখ্যা সাত থেকে বাড়িয়ে ১১ করা হয়। তবে সর্বশেষ দুইজন বিচারপতি নিয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠতা অগ্রাহ্য করার অভিযোগ উঠেছে। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সর্বজ্যেষ্ঠ একজন বিচারপতি পদত্যাগ করেন।

এছাড়াও আদালত প্রশাসন ও মামলা ব্যবস্থাপনায় তদারকি, বেঞ্চ পুনর্গঠন, বেঞ্চের এখতিয়ার সুস্পষ্ট করে দেওয়ার ফলে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তির হার বেড়েছে। গত দুই বছরে বিভিন্ন আদালতে ১৭ লাখের বেশি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং প্রায় ১৯.৪২ লাখ মামলা চলমান।[৮৯] সুপ্রিম কোর্টের মাসিক সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১০ এর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১১ এর ১২ মে পর্যন্ত ৯২ হাজার ৬১টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।[৯০]

৭.৩.২ *বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা*

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচার, স্বাধীনতার ও নিরাপত্তার অধিকার দেওয়া হয়েছে।[৯১] তারপরও 'ক্রসফায়ার', 'বন্ধুকযুদ্ধ', বা 'এনকাউন্টার' এর নামে বিচার-বহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৪ এর ২৬ মার্চ হতে ২০০৯ এর ২১ অক্টোবর পর্যন্ত চারদলীয় সরকারের আমলে "হার্ট অ্যাটাক" এ মৃত্যু হিসেবে উল্লিখিত এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে প্রায় ১,৬০০ জন।

সারণি ৩: বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড (জানুয়ারি ২০০৯ - জুন ২০১১)

ধরন	সংখ্যা
কারা হেফাজতে মৃত্যু	১৯৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মৃত্যু*	৪১৯
মোট	**৬১২**

* *ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার বা বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু হিসেবে পত্রিকায় প্রকাশিত।*
তথ্যসূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র।[৯২]

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের বিষয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। ২০০৯ এর ১১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যারা ঘটাবে তাদেরও বিচারের সম্মুখীন করা হবে বলে সংসদে জানান। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে অনুরূপ অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু ক্রমেই সরকার তাদের এ অঙ্গীকার থেকে সরে আসে, বিশেষকরে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের বিভিন্ন বক্তব্যে বিচার-বহির্ভূত হত্যার অনুপস্থিতির দাবি প্রকারান্তরে নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয়।[৯৩]

---

[৮৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০।
[৮৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০।
[৮৯] *ডেইলি স্টার*, ২১ মার্চ ২০১১।
[৯০] *ডেইলি স্টার*, ১৬ মে ২০১১।
[৯১] বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ।
[৯২] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন www.askbd.org
[৯৩] নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা কখনোই বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একতরফাভাবে গুলি খাবে, প্রাণ হারাবে তা তো হতে পারে না"

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের[৯৪] ব্যত্যয় ঘটলে হাইকোর্টে রিট করা যায়। বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দায়ের করা রিট আদালত আমলে নিলেও এখন পর্যন্ত ক্রসফায়ার বন্ধ হয়নি।[৯৫] প্রায় ৫০ জন বিডিআর জওয়ানকে বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে হত্যা করা হয়।[৯৬] বেশ কয়েকটি ঘটনা পর্যবেক্ষণের পর আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু এবং অমানুষিক নির্যাতনের ঘটনার ব্যাখ্যা চায়। পূর্ণ পেশাদারিত্ব নিয়ে পুলিশ তথা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়িত্ব পালনের আদেশ দেয় উচ্চ আদালত।[৯৭] দেশে সব ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে ২০০৯ এর ১৭ নভেম্বর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেয় হাইকোর্ট, এবং সরকারকে একটি *সুয়োমোটো* রুলের শুনানিতে মৌখিকভাবে নির্দেশ দেয়, এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা জারি করে। কিন্তু এর পরও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়নি।

৭.৩.৩ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন করার অঙ্গীকার ছিল। ২০০৯ এর ১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মত ক্ষমতায় এসে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন যা গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে থেমে যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে এই মামলা সচল করার উদ্যোগ নেয় এবং সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া শেষে এই রায় প্রদান করে উচ্চ আদালত যা আইনের শাসন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[৯৮]

৭.৩.৪ যুদ্ধাপরাধের (মানবতাবিরোধী অপরাধের) বিচার

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার। ক্ষমতা গ্রহণের পরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার প্রক্রিয়ায় যুদ্ধাপরাধী কারা এবং তাদের কোন আইনে বিচার করা হবে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট, ১৯৭৩' অনুযায়ী মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার, এবং ২০১০ এর ২৫ মার্চ বিচারের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। এর জন্য তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্টের ৬ ধারার ক্ষমতাবলে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ১২ সদস্যের আইনজীবী প্যানেল এবং সাত সদস্যের তদন্তকারী সংস্থা নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং পুরানো হাইকোর্ট ভবনকে আদালত হিসেবে প্রস্তুত করা হয়। ২০১০ এর ২১ জুলাই গণহত্যার দায়ে ১০ জনের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা পাঠানো হয়।[৯৯]

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার জন্য বরাদ্দ দেওয়া অর্থ তারা নিজেদের প্রয়োজন মতো ব্যয় করতে পারবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এবার অর্থ বরাদ্দ কমানো হয়েছে - গত বছর বরাদ্দ ছিল পাঁচ কোটি টাকা; এবার তা দুই কোটি টাকা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ৫০ জন মানবতাবিরোধী অপরাধীর তালিকা দেওয়া হয়েছে এই ট্রাইব্যুনালে। সারা দেশে বৃহত্তর জেলাগুলোতে তদন্ত সংস্থার ২০টি তদন্ত কার্যালয় খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় মানবতাবিরোধী অপরাধী থাকায় কার্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলায় এমন তদন্ত কার্যালয় খোলা হবে। তদন্ত সংস্থা ২০১১ এর ৩১ মে একজনের বিরুদ্ধে প্রধান প্রসিকিউটরের (রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী) কাছে ১৫ খণ্ডের প্রতিবেদন জমা দেয়। এই প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল ১১ জুলাইয়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের নির্দেশ দিলেও এই সময়ের মধ্যে বিচার সম্ভব নয় বলে জানা যায়। তদন্ত সংস্থা আশা করছে, ২০১১ এর ডিসেম্বরের মধ্যে ১৫ জনের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারবে।

(২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯)। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু বলেন, "'ক্রসফায়ার' বলতে কিছু নেই। ক্রসফায়ার নিয়ে যে সব কথা বলা হয় তা আদৌ ক্রসফায়ার নয়। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আত্মরক্ষার সময় এসব মৃত্যু ঘটে" (১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯)। পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির মতে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে সরকার সচেষ্ট কিন্তু রাতারাতি তা বন্ধ করা সম্ভব না (৩০ মে ২০০৯)। আবার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী র‍্যাব কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, "আপনার হাতে লাঠি থাকতে সাপ আক্রমণ করলে আপনি তখন কি করবেন?"

[৯৪] *বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২৭ ও ৩১।

[৯৫] নীতি গবেষণা কেন্দ্র (এনজিকে), 'জুডিশিয়ারি ইন বাংলাদেশ: রিভিউ ২০০৯', ২০১০।

[৯৬] দি হিউম্যান রাইটস টুডে ডট ইনফো, 'র‍্যাব ওদের পক্ষে?', ১৮ নভেম্বর ২০০৯।

[৯৭] *ডেইলি স্টার*, ২৫ নভেম্বর ২০০৯। আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মাদারীপুরে লুৎফর খালাসি ও খায়রুল খালাসি নামে দু'ভাইকে গুলি করে হত্যার ঘটনাটি কেন বিচারবহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না তা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকার ও র‍্যাবের কাছে জানতে চেয়ে সময়সীমা বেঁধে দেন।

[৯৮] *ডেইলি স্টার*, ২০ নভেম্বর ২০০৯।

[৯৯] উল্লেখ্য, যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালে দালাল আইনে সারা দেশে ৬২টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সে সময় ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে চিহ্নিত করে বিচারের কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে ৭৫২ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করা হয় এবং আটক অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, অর্থ ও কারিগরি সহযোগিতার অভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। কোনো সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়াই তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় জনবল, আবাসন, কারিগরি এবং অন্যান্য সহযোগিতাও পাচ্ছে না সংস্থার সদস্যরা। অন্যদিকে সদস্যদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার মন্ত্রণালয়ের মৌখিক প্রস্তাব এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।[১০০]

৭.৩.৫ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭১ সাল হতে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পর্যন্ত বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক রুজুকৃত সকল মামলা[১০১] পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেয়। এ উদ্দেশ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি[১০২] এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে উপ-কমিটি গঠন করা হয়, যারা সব ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মামলা চিহ্নিত করবে এবং তা প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এই উদ্যোগে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে কাউকে রাখা হয়নি, এমনকি কোনো স্বতন্ত্র আইনজীবীকেও রাখা হয়নি।[১০৩] ২০১০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বৈঠকে ১০,২৯৩টি মামলা প্রত্যাহারের জন্য উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কমিটি এ পর্যন্ত ৬,৬৫৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে।[১০৪] দেখা যায় রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহারের ঘটনা বাড়ছে। এর ফলে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বিবেচনা করে ডাকাতি, হত্যা ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই এসব মামলার বাদি ও আসামিরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না।[১০৫]

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ২০১১ এর ১৪ জুলাই লক্ষ্মীপুর বিএনপি দলীয় নেতা অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামকে খুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এ এইচ এম বিপ্লবকে ক্ষমা প্রদান করেন। লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতা এবং লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বর্তমান মেয়র আবু তাহেরের ছেলে বিপ্লব এলাকায় একজন সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত এবং খুনসহ নানা ধরনের অপরাধের জন্য অনেকগুলো মামলায় অভিযুক্ত। এই ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনায় সরকারের ব্যাপক সমালোচনা হয়। এই ক্ষমার বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করে। বিরোধীদলীয় এমনকি সরকারদলীয় নেতাদের অনেকে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনায় যথাযথ আইন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ করে। উল্লেখ্য, এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ২২ জন অপরাধীকে ক্ষমা প্রদান করেছেন, যাদের মধ্যে ২১ জনই আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। এসব ক্ষমা পর্যালোচনা করে দেখা যায় সব দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কোনো না কোনোভাবে বর্তমান সরকারি দলের সাথে সংশ্লিষ্ট।[১০৬]

৭.৩.৬ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

বর্তমান সরকার বিচার বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেওয়ার লক্ষ্যে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামো তৈরি, বিচারক, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য পদে জনবল নিয়োগ, লজিস্টিকস সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়েছে। উচ্চ এবং নিম্ন আদালতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন করেছে, এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতিসহ প্রশাসনিক বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[১০৭] এছাড়া নিম্ন আদালতের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১০৮] এখনো উচ্চ এবং নিম্ন আদালতে বিচারক সংকট

---

[১০০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০১১।

[১০১] রাজনৈতিক মামলা হিসেবে পরিচিত যা রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্য করা হয়।

[১০২] আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যরা হলেন, আইন প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (পুলিশ) ও আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (আইন) কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করেন।

[১০৩] *ডেইলি স্টার*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

[১০৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ জানুয়ারি ২০১১।

[১০৫] আইন ও সালিশ কেন্দ্র, *মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১০*। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে দুর্নীতি, খুন, ডাকাতি, ধর্ষণের অনেক মামলা 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা' হিসেবে সরকার প্রত্যাহার করেছে। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক বিবেচনায় যতগুলো মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই ছিল সরকারদলীয় সমর্থকদের। আবার এমন মামলাও প্রত্যাহার করা হয়েছে যে, ওই সব মামলার বাদি-বিবাদি কেউই কোনো দলের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল না। এছাড়াও ৫২টি দুর্ধর্ষ ডাকাতির মামলাও প্রত্যাহার করা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ জানুয়ারি ২০১১)।

[১০৬] মোহাম্মদ বদরুল আহসান, 'দ্য পারডনিং প্রেসিডেন্ট', *ডেইলি স্টার*, ২৯ জুলাই ২০১১।

[১০৭] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, এবং নীতি গবেষণা কেন্দ্র, 'জুডিশিয়ারি ইন বাংলাদেশ: রিভিউ ২০০৯', ঢাকা, মার্চ ২০১০।

[১০৮] *প্রাগুক্ত*। এছাড়াও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে নিম্ন আদালতে পদোন্নতি, পদায়ন, শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষমতা এখনো রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়েছে, যেখানে আইন মন্ত্রণালয় সাচিবিক সহায়তা দিয়ে থাকে (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ২৭ জুন ২০১১; *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ জুলাই ২০১১)।

রয়েছে। বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন, অপসারণ, বেতন ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।[১০৯] জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচনা সত্ত্বেও বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়নি। রাজনৈতিক বিবেচনায় হত্যাকাণ্ড, ডাকাতির মত মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ আসছে এবং তা জাতীয় কমিটি বিবেচনা করছে। বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ২১ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদান করেন। এ ধরনের ক্ষমা, রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার, বিচার-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, এবং অব্যাহত বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা ব্যাহত হচ্ছে বলে হতাশা বাড়ছে।

সারণি ৪: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা	▪ অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন ▪ প্রধান বিচারপতিসহ ১৭ জন বিচারপতির সম্পদের বিবরণী দাখিল ▪ বিচার বিভাগের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ▪ নিম্ন আদালতে ২০৭ বিচারক নিয়োগ; হাইকোর্টে ৪৫ জন বিচারক (স্থায়ী ১৩ জন এবং ৩২ জন অতিরিক্ত বিচারক) নিয়োগ; দুই বছরে নিম্ন আদালতে ১৭ লাখের বেশি মামলার নিষ্পত্তি ▪ বৃহত্তর ১৯ জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ এবং ২৭ জেলায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ ▪ উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ ▪ ১৯৭১ এর পর থেকে দায়েরকৃত সব 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' মামলা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ	▪ বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন না করা ▪ সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে নিম্ন আদালতের প্রশাসনিক বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব অব্যাহত
বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা	▪	▪ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ▪ আড়াই বছরে কারা হেফাজতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মৃত্যু ৬১২ জনের
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন	▪ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় প্রকাশ এবং পাঁচ জনের ফাঁসি কার্যকর	
যুদ্ধাপরাধের বিচার	▪ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ	
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা		▪ রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বিবেচনা করে ডাকাতি, হত্যা ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ; ১০,২৯৩টির মধ্যে ৬,৬৫৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ ▪ মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের কারণে আইনের শাসনের মূল চেতনা ব্যাহত

৭.৪ তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা ছিল বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।[১১০] পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।[১১১]

---

[১০৯] *প্রাগুক্ত*।

[১১০] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "... প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে ..." (প্যারা ৫.৬); "সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা হবে" (প্যারা ১৯.১); "... ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দিতে হবে" (প্যারা ২); "প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে" (প্যারা ৫.৩); "... প্রতি দফতরে গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিক সনদ উপস্থাপন করা হবে ..." (প্যারা ২); "সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা ... করা হবে" (প্যারা ১৯.২)। এছাড়াও ভিশন ২০২১ এ বলা হয়, "নাগরিক অধিকার সনদ রচনা, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং সরকারি দলিল দস্তাবেজ কম্পিউটারায়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে দুর্নীতির পথগুলো সম্ভাব্য সকল উপায়ে বন্ধ করা হবে।"

[১১১] সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা মুক্ত চিন্তা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে চাই" (সূত্র: *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৩ এপ্রিল ২০১০)। দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি বলেন, "বর্তমান

৭.৪.১ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য উদ্যোগ

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদের বিশেষ কমিটি ২০০৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ' অনুমোদনের বিষয়ে সম্মত হয়। ২০০৯ সালের ১৫ মার্চ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' সংসদে উপস্থাপন করা হয়, যা ২৯ মার্চ সংসদের প্রথম অধিবেশনেই গৃহীত হয়। তবে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' কার্যকর হয় ১ জুলাই থেকে,[১১২] এবং পরবর্তীতে এর বিভিন্ন ধারায় সংশোধন করা হয়। এর পাশাপাশি 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১' প্রণীত হয় যা তথ্য প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সরকারিভাবে ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু করা হয়। এ কার্যক্রমের অধীনে ইন্টারনেট, অল্প খরচে কম্পোজ, প্রিন্টিং, ছবি তোলা ও স্ক্যানিং এর সুবিধা পাওয়া যাবে। এসব ইউনিয়নে একটি করে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রিন্টার ও মডেম এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে প্রতিটি ইউনিয়নে দু'টি করে কম্পিউটার, স্ক্যানার ও হেডফোন দেওয়া হয়েছে। তবে এ কার্যক্রম সম্পর্কে অধিকাংশ এলাকায় স্থানীয় জনগণ জানে না।[১১৩] এসব তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করা হলেও অনেকগুলোই পুরোপুরি চালু হয়নি।

অল্প খরচে ও কম সময়ে বিচার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১১ সালের ৫ মে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) আর্থিক সহায়তায় ইনফোরেভ লিমিটেড ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের অধীনে মুঠোফোন থেকে এসএমএস পাঠিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারাধীন মামলার সর্বশেষ অবস্থা ও ফলাফল জানা যাবে। তবে এ কার্যক্রমের আওতায় শুধু এ বছরের ২ মে থেকে শুরু হওয়া মামলা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।[১১৪] তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণে ও বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি নিরসনে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এছাড়া ২০১১ এর ৩১ মে দুদক 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১১' এর অনুমোদন দেয়। এ নীতিমালা অনুযায়ী এ বছরের জুন থেকে শুরু করে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার কমিশনের নিজস্ব কার্যালয়ে কমিশনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে জানানো হবে।[১১৫]

তবে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্য প্রকাশের মানসিকতার অভাব দেখা যায়। নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ছাড়া সব বিষয়ে তথ্য জানার অধিকার জনগণের থাকলেও নানা অজুহাতে কিছু কিছু মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্মকর্তা কোনো ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে চান না। এ ধরনের অভিযোগ পাওয়ার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন থেকে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার জন্য তথ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১০ এর ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে বলেন, "সরকারি অফিসের কোনো তথ্য সবাইকে দেওয়া হবে না। এভাবে তথ্য দিলে সরকারি কর্মকর্তারা কাজ করতে পারবেন না"।[১১৬]

৭.৪.২ তথ্য কমিশন গঠন

২০০৯ সালের ২ জুলাই তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।[১১৭] উল্লেখ্য, আইন অনুযায়ী কমিশনার নিয়োগের জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বাছাই কমিটিতে বিরোধীদলীয় একজন সংসদ সদস্য ছিলেন। তবে দ্রুত গঠিত হলেও প্রধান কমিশনারের অবসর গ্রহণের কারণে কমিশন পুরোপুরিভাবে কাজ শুরু করতে পারেনি।[১১৮]

আইন বাস্তবায়নের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় যা মূল্য সংক্রান্ত অংশে কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ চূড়ান্ত হয়ে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ২০১০ এর ৮ মার্চ। ২০১১ এর ৯ জানুয়ারি 'তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১' এবং ২০১০ এর ২২ আগস্ট 'তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা,

---

সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাস করে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন গঠন করেছে। গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে" (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জানুয়ারি ২০১১)।

[১১২] ধারা ১ এর ২ (ক) অনুযায়ী, "ধারা ৮, ২৪ ও ২৫ ব্যতীত অন্যান্য ধারা ২০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং (খ) অনুযায়ী ধারা ৮, ২৪ ও ২৫ জুলাই ১, ২০০৯ থেকে কার্যকর হইবে"।

[১১৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ ডিসেম্বর ২০১০।

[১১৪] প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০১১

[১১৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জুন ২০১১।

[১১৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০।

[১১৭] এম আজিজুর রহমান প্রধান তথ্য কমিশনার, এবং এম এ তাহের ও সাদেকা হালিম তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

[১১৮] প্রধান তথ্য কমিশনার এম আজিজুর রহমান ৬৭ বছর বয়স হওয়ার কারণে ২০১০ এর ১০ জানুয়ারি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অবসরে গেলে সাবেক রাষ্ট্রদূত মো. জমির ২০১০ এর ৩১ মার্চ নতুন প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে যোগ দেন। মাত্র ছয় মাসের জন্য তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হল কেন জানতে চাইলে কমিশন থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

২০১০' প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে কমিশনের অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হলেও ৭৬ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি। বর্তমানে কমিশনে ১৪-১৫ জন কর্মকর্তা কর্মরত।[১১৯]

আইন মোতাবেক প্রত্যেক সরকারি অফিসে সেবা গ্রহণকারী জনগণের জন্য 'তথ্য সরবরাহ শাখা' খোলা এবং একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের কথা থাকলেও তা অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়েছে। আইন অনুযায়ী আইন জারির ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৯,৭৮০ জনকে (সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৭,৫৪২, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ২,২৩৮)।[১২০]

'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' অনুযায়ী কমিশন আর্থিকভাবে স্বাধীন। তথ্য কমিশনের তহবিল সরকার কর্তৃক বার্ষিক অনুদান ও সরকারের সম্মতিক্রমে কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং এর পরিচালনা ও প্রশাসন তথ্য কমিশনের উপর ন্যস্ত। তথ্য কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দিয়ে কমিশনের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সরকার এর অনুকূলে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না মর্মে বিধান রাখা হয়েছে।[১২১] কিন্তু খরচের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আগাম অনুমোদনের অভাবে অর্থ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। কমিশনকে তথ্য, সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে বলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। অনুমোদিত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। অনুসন্ধান এবং গবেষণা করার জন্য পৃথক সেল করার প্রক্রিয়াও আটকে আছে বাজেট আটকে থাকার কারণে। উল্লেখ্য, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ছয় কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ছয় কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দ হয়। ইতোমধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।[১২২]

৭.৪.৩ ক্ষমতাধরদের আর্থিক তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করার কথা থাকলেও সরকার গঠনের পর থেকে এই বিষয়ে কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ২০১০ এর ৮ জানুয়ারি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে নির্বাচনের আগে সব সংসদ সদস্য যেহেতু নির্বাচন কমিশন এবং এনবিআর এ সম্পদের হিসাব জমা দিয়েছেন সেহেতু নির্বাচন কমিশন তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারে।[১২৩] পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্যদের দাখিল করা সম্পদের হিসাবের হলফনামা এবং নির্বাচনে তাদের ব্যয়ের হিসাবের হলফনামা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। তবে ২০১১ সালের ২০ মার্চ মন্ত্রী ও মন্ত্রী পদমর্যাদার ব্যক্তিদের সম্পদের হিসাব বিবরণী সরকার প্রকাশ করবে না বলে অর্থমন্ত্রী জানান।[১২৪] অন্যদিকে ২০১০ এর ১৭ জুন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আয়কর বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।[১২৫] সম্প্রতি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ সরকার বা প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত সম-মর্যাদা ও তুলনীয় মর্যাদার ব্যক্তিদের সম্পদ ও হিসাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার বিষয়টি মন্ত্রসভা অনুমোদন করেছে। তবে এ হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে।[১২৬] আরও উল্লেখ্য, এই নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি।

তবে অর্থমন্ত্রী ২০১০ এর ৫ সেপ্টেম্বর ট্যাক্স জোন-৮ এ অনলাইনে কর প্রদান ব্যবস্থার উদ্বোধনীতে তাঁর আর্থিক তথ্য প্রকাশ করেন।[১২৭] প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি ২০১০ এর ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯-১০ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করে।[১২৮] এছাড়াও গত দুই অর্থবছরের দলীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন

---

[১১৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ মার্চ ২০১১।

[১২০] তথ্যসূত্র: তথ্য কমিশন, আগস্ট ২০১১।

[১২১] তথ্য কমিশন, *প্রাগুক্ত*।

[১২২] *তথ্য অধিকার আইন ২০০৯*, ধারা ১৩ (৫) (ণ)।

[১২৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি ২০১০।

[১২৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ মার্চ ২০১১।

[১২৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ জুন ২০১০। উল্লেখ্য, আয়কর আইন অনুযায়ী কারও আয়কর বিবরণী প্রকাশ করা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হলে আয়কর আইনের পরিবর্তন করতে হবে।

[১২৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ জুলাই ২০১১।

[১২৭] *ডেইলি স্টার*, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০।

[১২৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ ও ২ জানুয়ারি ২০১১। উল্লেখ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিবছর ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রতিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে পূর্বের পঞ্জিকা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে

কমিশনে জমা দিলেও এসব তথ্য নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেনি। ২০১০ এর ৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিচারপতিদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার কথা বলেন, তবে একই বছর ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির কাছে সম্পদের হিসাব জমা দেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি ২০১১ এর ৩ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের সব বিচারপতির সম্পদের হিসাব দেওয়ার আহ্বান জানানোর পর এ পর্যন্ত ১৯ জন বিচারপতি তাঁদের সম্পদের হিসাব প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিয়েছেন।[১২৯] তবে এখন পর্যন্ত দাখিল করা সম্পদের হিসাবে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার নেই।

স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের জন-প্রতিনিধি নির্বাচনেও প্রার্থীদের মৌলিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়নি।[১৩০] জাতীয় নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট আইনে এটি নিশ্চিত করা হলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনে নির্বাচন সংক্রান্ত ধারায় এটি উল্লেখ করা হয়নি, যা ভোটারদের একটি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে ২০১১ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ২৪৬টি পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের সাত তথ্য[১৩১] দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় এবং প্রথমবারের মত তা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া হলফনামা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারপত্র (লিফলেট) আকারে ছেপে প্রচার করা হয় ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে টাঙানো হয়। পৌরসভা নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই প্রথম প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য এনজিও, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও ভোটারদের মধ্যে প্রচারের উদ্যোগ নেয় নির্বাচন কমিশন। প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে দাখিলকৃত তথ্য প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর জাতীয় বা স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্রিকায় বা স্থানীয় প্রেসক্লাবে পাঠানোর বিধান করা হয়।[১৩২]

৭.৪.৪ প্রত্যেক দফতরে নাগরিক সনদ উপস্থাপন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় (এবং কিছু কিছু এনজিও'র উদ্যোগে) সরকারি দফতর বিশেষকরে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও প্রদর্শনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ প্রতি দফতরে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিক সনদ উপস্থাপন করা হবে বলে নির্বাচনী অঙ্গীকার করে।

প্রথম পর্যায়ে সরকারের উদ্যোগে যেসব দফতরের জন্য নাগরিক সনদ প্রস্তুত করা হয় সেসব সনদের কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কিছু কিছু দুর্বলতা দেখা যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এর আওতায় ইউএনডিপি'র কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের মতামত নিয়ে নতুনভাবে নাগরিক সনদ প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুই পর্যায়ের নাগরিক সনদকে ভিন্নতা দিতে প্রথম পর্যায়ের নাগরিক সনদকে 'ফার্স্ট জেনারেশন সিটিজেন চার্টার' এবং পরবর্তীতে যেটি হবে তা 'সেকেন্ড জেনারেশন সিটিজেন চার্টার' হিসেবে নামকরণ করা হয়। প্রতিটি বিভাগ ও কিছু জেলা শহরে সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে 'ফার্স্ট জেনারেশন সিটিজেন চার্টার' এর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সনদ প্রস্তুত করতে একটি নাগরিক সনদ নির্দেশিকা তৈরি করা হয়।[১৩৩] ১৪টি জেলায় দুইটি করে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে নাগরিক সনদ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে চারটি জেলায় কর্মশালার মাধ্যমে এসব নাগরিক সনদ প্রণীত হচ্ছে; ২০১১ সালের মধ্যে বাকি জেলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।[১৩৪]

৭.৪.৫ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল

আওয়ামী লীগের আরেকটি প্রতিশ্রুতি ছিল গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সংবিধানেও বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।[১৩৫] বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম আগেও স্বাধীন ছিল, তবে গণতন্ত্র পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছু কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়) এর ব্যতিক্রম হয়েছে। তাদের মতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেটুকু রয়েছে তা খর্ব হচ্ছে কিনা সেটা পরিবীক্ষণ করা অনেক বেশি জরুরি। অনেকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে ব্যক্তির বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করাকে অন্যতম সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন।[১৩৬]

হবে এবং পরপর তিনবার কোনো দল দিতে ব্যর্থ হলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে। তবে এনবিআর এর আইন অনুযায়ী যে ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সে তালিকায় রাজনৈতিক দল নেই।

[১২৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০১১।

[১৩০] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯*।

[১৩১] সাতটি তথ্য হচ্ছে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফৌজদারি মামলা আছে কিনা, অতীতে ফৌজদারি মামলা থাকলে তার ফলাফল, পেশা, আয়ের উৎস, প্রার্থী ও প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সম্পদ ও দায়-দেনা সম্পর্কিত তথ্য এবং ঋণ সংক্রান্ত তথ্য। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের সাতটি ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

[১৩২] উৎস: নির্বাচন কমিশনের পরিপত্র ৭ ও *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ ডিসেম্বর ২০১০।

[১৩৩] দেখুন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, *জনমুখী সেবা প্রদান: নাগরিক সনদ নির্দেশিকা*, সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, ২০১০।

[১৩৪] এই কার্যক্রমে টিআইবি সিএসসিএমপি এর সাথে যৌথভাবে কাজ করছে।

[১৩৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৩৯।

[১৩৬] ২১ অক্টোবর ২০১০ প্রথম আলোর উদ্যোগে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা এ মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে সমালোচনার প্রেক্ষিতে তিনি সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সমালোচনা করলে সাংবাদিক মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১)।

তবে সংবাদ প্রকাশের পর সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্টদের হয়রানি হ্রাসে সরকার সম্প্রতি সিআরপিসি'র ৫০০ ও ৫০১ ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়, যেখানে মানহানির নামে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পরপর তিনবার সমন জারির পর সাড়া না পেলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার বিধান করার সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে 'ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) বিল, ২০১১' জাতীয় সংসদে পাস হয় ২০১১ এর ২ ফেব্রুয়ারি।[১৩৭]

কেস স্টাডি ১

***দৈনিক আমার দেশ* পত্রিকার প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ**

২০০৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশক হিসেবে হাসমত আলী ও সম্পাদক আতাউস সামাদকে নিয়ে *দৈনিক আমার দেশ* পত্রিকার যাত্রা শুরু। ২০০৯ সালের ২৬ এপ্রিল নতুন পরিচালনা পরিষদ গঠন করে মাহমুদুর রহমান চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে মাহমুদুর রহমান প্রকাশক হওয়ার জন্য আবেদন করলেও তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি, যে কারণে হাসমত আলীকে প্রকাশক দেখিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশনা চালিয়ে যেতে হয়।[১৩৮] সরকারের ভাষ্যমতে প্রকাশকের ছাড়পত্র না পাওয়া ও প্রকাশকের ইস্তফার ভিত্তিতেই প্রকাশনা আইন অনুযায়ী এই পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল করা হয়।[১৩৯] বিভিন্ন পর্যায়ে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ৩১টি মামলা করা হয়।

বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এক যুক্ত বিবৃতিতে এই ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে আখ্যায়িত করে। এই পদক্ষেপ স্বাধীনভাবে তথ্য ও মত প্রকাশের ওপর বড় ধরনের হুমকি বলেও তারা মনে করে। এদিকে সম্পাদকের আইনজীবী ৫ জুন ২০১০ তারিখে প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করে যে, পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হলেও কারা কর্তৃপক্ষ তাকে মামলা পরিচালনার অনুমতিপত্র ও ওকালতনামায় সই করতে দিচ্ছে না।[১৪০]

পরবর্তীতে *দৈনিক আমার দেশ* পত্রিকার প্রকাশনার ব্যাপারে ২০১০ এর ১৮ জুলাই আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতের দেয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয় সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত রাখতে সরকারের দায়ের করা আবেদনও খারিজ করে দেয়। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগের ছয় বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এই আদেশের ফলে *দৈনিক আমার দেশ* পত্রিকার প্রকাশনায় আর কোনো আইনি বাধা ছিল না। অন্যদিকে সরকার পক্ষের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের মতে *আমার দেশ* প্রকাশনায় বাধা নেই এমন কোনো আদেশ আপিল বিভাগ দেয়নি, এবং প্রকাশক ছাড়া কোনো পত্রিকা বের করা সঙ্গত হবে না।[১৪১] উল্লেখ্য, পত্রিকাটি পূর্বের নিয়মে এখন প্রকাশনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে মাহমুদুর রহমানকে আদালত অবমাননার দায়ে হাজতে রাখা হয় এবং তার কারাভোগ শেষ হয় ২০১১ এর ১৭ মার্চ।

বেসরকারি চ্যানেলের লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিটিভি'র দুপুর দুইটা ও রাত আটটার সংবাদ প্রচার করা বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে বেসরকারি চ্যানেলের মালিকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রাত আটটার সংবাদ প্রচার করা থেকে চ্যানেলগুলোকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠকের প্রেক্ষিতে বর্তমানে সবগুলো বেসরকারি চ্যানেল বিটিভি'র দুপুর দুইটার সংবাদ প্রচার করছে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় বেসরকারি চ্যানেলের অনুমতি দেওয়া ও বাতিল করার প্রচলন সম্পর্কে এখনো কোনো নীতিমালা প্রণীত হয়নি। ২০০৯ এর ২০ নভেম্বর তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ যমুনা টেলিভিশনের প্রচারণা বন্ধ করে দেয়,[১৪২] এবং ২০১০ এর ২৭ এপ্রিল 'টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১'

---

[১৩৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১। উল্লেখ্য, পূর্বে মানহানিকর সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে সংবাদপত্রের প্রকাশক, সম্পাদক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিধান ছিল।

[১৩৮] জেলা প্রশাসক অফিসে চিঠি লিখে হাসমত আলীর পদত্যাগ ও প্রকাশক হিসেবে মাহমুদুর রহমানের নাম ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়। ২০০৯ এর ৫ নভেম্বর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের উপপরিচালক (নিবন্ধন) স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে জেলা প্রশাসক অফিসকে জানানো হয় যে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করায় হাসমত আলীর পরিবর্তে প্রকাশক হিসেবে মাহমুদুর রহমানের নাম প্রতিস্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এরপর দীর্ঘদিন জেলা প্রশাসক অফিস এ বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। পরবর্তীতে মাহমুদুর রহমান ও আমার দেশ এর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে অর্থাৎ গ্রেপ্তারে বাধাদানের অভিযোগও আনা হয় (সূত্র: আসিফ নজরুল, 'আমার দেশ: সরকারের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জুন ২০১০)।

[১৩৯] *দৈনিক যুগান্তর* ২ জুন ২০১০; *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৩ জুন ২০১০; *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ জুন ২০১০।

[১৪০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ জুন, ২০১০।

[১৪১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জুলাই ২০১০।

[১৪২] *বিডিনিউজ২৪.কম*, ১২ জুন, ২০১০। বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জানান, চ্যানেলটির কর্তৃপক্ষ প্রচারণার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করেনি। এদিকে চ্যানেলের পরিচালক (সংবাদ) জানান, বিটিআরসি ও পুলিশ কোনো ধরনের পূর্ব-সংকেত ছাড়াই চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়। তিনি আরও জানান, ২০০২ সালে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করলেও বিএনপি ক্ষমতায় এসে তা বাতিল করে দেয়। এরপর তারা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে লাইসেন্সের অনুমতি নিয়ে পুনরায় প্রচারণায় যান। কাজেই তার মতে অনাপত্তি সনদপত্র অপ্রয়োজনীয়। ২০০৯ এর ২২ নভেম্বর টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করে।

এর ৫৫(৪) ধারা ভঙ্গের কারণে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'চ্যানেল ওয়ান' বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৪৩] উল্লেখ্য, বেসরকারি টেলিভিশনের জন্য লাইসেন্স বরাদ্দ করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, তবে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি নিতে হয় বিটিআরসি'র কাছ থেকে। সরকারের একই ধরনের আরেকটি পদক্ষেপ ছিল ২০১০ এর ১ জুন প্রকাশক আলহাজ্ব হাসমত আলীর আবেদন ও মামলার পরিপ্রেক্ষিতে *দৈনিক আমার দেশ* পত্রিকার প্রকাশনা ও বিতরণ বাতিল করা। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের উদ্যোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সরকারের এই সিদ্ধান্ত অবাধ তথ্যপ্রবাহের বিষয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়াও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হলেও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না।

তথ্যমন্ত্রী সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই গণমাধ্যমের (সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) জন্য জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে বলে জানান।[১৪৪] টিভি চ্যানেল ও রেডিও লাইসেন্স কারা পাবে তার কোনো নির্দিষ্ট নীতি না থাকার করণে এটি সম্পূর্ণ সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তাই সাংবাদিক মহলেও এই নীতিমালাটি দ্রুত প্রণয়নের দাবি লক্ষ করা যায়। অনেকে প্রস্তাব করেন খসড়া নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে দেওয়া উচিত।[১৪৫]

বর্তমান সরকার ২০০৯ এর ১১ অক্টোবর দশটি ও ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিলে দু'টিসহ মোট ১২টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমোদন দিলেও সাতটি[১৪৬] নিয়মিত সম্প্রচার শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন স্থাপন ও পরিচালনা নীতি অনুযায়ী কোনো চ্যানেল অনুমোদনের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে চালু না হলে অনুমতির আদেশ বাতিল হয়ে যাবে। অথচ এ বিষয়ে সরকারের কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।[১৪৭] ২০১০ এর ফেব্রুয়ারি তথ্য মন্ত্রণালয় 'বেসরকারি মালিকানাধীন এফএম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০' নামে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।[১৪৮]

অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা এবং 'ডিজিটাল' বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির প্রতি একটি নেতিবাচক পদক্ষেপ ছিল সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট 'ফেসবুক' এর ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ। বিটিআরসি ২০১০ এর ২৯ মে ইন্টারনেট গেটওয়ের দুটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ও ম্যাঙ্গো টেলি সার্ভিসেসকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন কিছু কার্টুন ও ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করা হচ্ছে এই কারণ দেখিয়ে চিঠি দিয়ে সাময়িকভাবে ফেসবুক বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে আবার ৫ জুন রাত পৌনে বারোটায় সারা দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য ফেসবুক উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।[১৪৯] এই ঘটনার পর হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে ২৬ জুলাই হাইকোর্ট কেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর অধীনে ওয়েবসাইট ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগ পদ্ধতি বন্ধ করার ক্ষমতা অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না সরকারকে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে একটি রুল জারি করেন।[১৫০]

৭.৪.৬ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

সরকার তথ্য অধিকার কমিশন গঠন করে জনগণের তথ্য অধিকারের বিষয়টিকে একটি শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিয়েছে। একজন মন্ত্রীর এবং প্রধান বিচারপতিসহ ১৯ জন বিচারপতির সম্পদের হিসাব দাখিল করা অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু, দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরির উদ্যোগ, এবং নির্বাচন কমিশনে সব সংসদ সদস্যের নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা সম্পদের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তবে প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনারের ছয় মাসের মাথায় অবসর গ্রহণ, বিধিমালা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগে শ্লথগতি, প্রস্তাবিত জনবল ও অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত করতে সময়ক্ষেপণ ও সর্বোপরি নিয়মানুযায়ী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত না করা প্রভৃতি সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়ন হয়নি। ক্ষমতাবানদের সম্পদের হিসাব প্রকাশে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই,

---

[১৪৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ এপ্রিল ও ১৭ মে ২০১০। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তরঙ্গ বরাদ্দের শর্ত ভঙ্গ করায় প্রতিষ্ঠানটিকে কয়েকবার নোটিশ পাঠানো হলেও চ্যানেল কর্তৃপক্ষ কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। এই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ান এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেডের পরিচালক হাইকোর্টে রিট দায়ের করে ২০১০ এর ২ মে। কিন্তু ১৬ মে তা সরাসরি খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট।

[১৪৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ০৪ অক্টোবর ২০১০।

[১৪৫] ২১ অক্টোবর ২০১০ প্রথম আলোর উদ্যোগে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা এ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

[১৪৬] সাতটি চ্যানেল হচ্ছে দেশটিভি, মাই টিভি, মোহনা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সময়, জিটিভি ও মাছরাঙ্গা।

[১৪৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ অক্টোবর ২০১০ ও ১ মার্চ ২০১১।

[১৪৮] বর্তমানে চারটি বেসরকারি মালিকানাধীন এফএম রেডিও স্টেশন সম্প্রচার চালাচ্ছে।

[১৪৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ মে ও ৬ জুন ২০১০।

[১৫০] *ডেইলি স্টার*, ২৭ জুলাই ২০১০।

যদিও সম্প্রতি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আয়-ব্যয় ও সম্পদের হিসাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাখিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বাতিল ও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বাতিল, এবং সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট 'ফেসবুক' সাময়িকভাবে বন্ধ করা নিয়ে সরকারের সমালোচনা হয়।

সারণি ৫: তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা	▪ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিধিমালা প্রণয়ন; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন ▪ ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু ▪ তথ্য সরবরাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ৯,৭৮০ জনকে (সরকারি ৭,৫৪২, বেসরকারি ২,২৩৮) নিয়োগ	▪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মৌলিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক না করা
তথ্য কমিশন গঠন	▪ তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন	
প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস জনসমক্ষে প্রকাশ	▪ নির্বাচন কমিশনে সব সংসদ সদস্যের নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা সম্পদের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ ▪ প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আয়কর বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ▪ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত	▪ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সংসদ সদস্যদের সম্পদের বার্ষিক হিসাব প্রকাশ না করা ▪ আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া সংক্রান্ত নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি
প্রত্যেক দফতরে নাগরিক সনদ উপস্থাপন	▪ দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ	
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল	▪ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পরপর তিনবার সমন জারির পর সাড়া না পেলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার বিধান	▪ বিতর্কিতভাবে দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ ও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বাতিল ▪ আট দিনের জন্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট 'ফেসবুক' বন্ধ

৭.৫ প্রশাসনের সংস্কার

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অধীনে প্রশাসনের সংস্কার অন্যতম।[১৫১] ইশতেহারে দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

৭.৫.১ দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা

সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রশাসন সংস্কারের একটি খসড়াপত্র চূড়ান্ত করা হয়, এবং এজন্য 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট' প্রণয়নের সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও কাজের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণে সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট এর খসড়া প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেন ২০১১ এর ১২ জানুয়ারি।[১৫২] এই আইনে অবসরের সময়সীমা ৬০ বছর নির্ধারণ, স্বেচ্ছা অবসরের সুযোগ, তিন স্তরের কর্মকর্তা বিন্যাসের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে চাকরিজীবনের ২০ বছর পরই বাধ্যতামূলক অবসর ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে এই আইনে সরকারি কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া ফৌজদারি বা অন্য কোনো মামলা করা যাবে না বলে ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই আইন প্রশাসনে রাজনীতিকরণ ও দুর্নীতির পথ সুগম করতে পারে। আইনের খসড়ার ওপর মতামত আহবানের জন্য এটি ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের পর এই আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হবে।

---

[১৫১] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার ... ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে" (প্যারা ৫.৬); " ... জাতীয় ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা হবে" (প্যারা ১৬.১); " ... ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে" (প্যারা ৫.২)।

[১৫২] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জানুয়ারি ২০১১।

প্রজাতন্ত্রের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতির বিধান নির্দিষ্ট করে 'নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা-পদোন্নতি) বিধিমালা ২০১১' জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৫৩] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে প্রশাসন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিভাগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এর অনুমোদন দিয়েছে। এটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং (সিপিটি) উইংয়ের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে।[১৫৪] এছাড়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়' করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়।

যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশাসনে অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত ১২ দফায় ১,২৭৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিতে গিয়ে ৮৫১ জনকে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়।[১৫৫] প্রশাসনে এ ধরনের ব্যাপক পদোন্নতি ও বদলির কারণে কর্মকর্তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় যার ফলে প্রাত্যহিক কাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে মনে করা হয়,[১৫৬] যদিও ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সালের ১১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সচিবদের সাথে এক বৈঠকে প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।[১৫৭] ২০০৯ এর সেপ্টেম্বরে পদোন্নতি-বঞ্চিতদের ক্ষোভ প্রকাশ্য রূপ নেয় এবং আদালত পর্যন্ত গড়ায়।[১৫৮] এছাড়াও আগের সরকারগুলোর মতোই অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক এবং সামরিক কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ধারা অব্যাহত ছিল। সরকারের আড়াই বছরে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ২১৫ জন।[১৫৯]

পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারও প্রশাসনে বিরোধীপন্থী বলে পরিচিত কর্মকর্তাদের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ('অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি' বা ওএসডি) করার ধারা অব্যাহত রাখে। সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ২০১০ এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৪৫৮ (সচিব নয় জন, অতিরিক্ত সচিব ৩৪ জন ও যুগ্ম সচিব ১৮৩ জন, এবং বাকিদের বেশিরভাগ উপসচিব)।[১৬০] উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ৬০০ (সারণি ৬)। দেখা যাচ্ছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ে মোট পদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে মোট পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ) কর্মহীন থাকছে।

সারণি ৬: সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ওএসডি'র সংখ্যা (২ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)

পদের নাম	কর্মকর্তার সংখ্যা	ওএসডি'র সংখ্যা	শতকরা হার
সচিব	৬৭	৮	১১.৯
অতিরিক্ত সচিব	১২৮	৩৩	২৫.৮
যুগ্ম সচিব	৫৬০	১৮৩	৩২.৭
উপসচিব	১,৫৪৬	১৫২	৯.৮
সিনিয়র সহকারী সচিব	১,৫৪৫	১৫৮	১০.২
সহকারী সচিব	৭২৮	৬৬	৯.১
মোট	**৪,৫৭৪**	**৬০০**	**১৩.১**

উৎস: সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (২ মার্চ ২০১১), http://www.moestab.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=439

সরকারি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি সংশোধনের উদ্যোগ। ২০১০ এর ১০ মে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় 'নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০' জারি করে। এতে প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদের ৫০% পূরণে সরকারি কর্ম-কমিশনকে সুপারিশের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এটি রহিত করে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারবে বলে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীনে ৩৫,৪৬০টি শূন্য পদ রয়েছে।[১৬১]

---

[১৫৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ এপ্রিল ২০১১।

[১৫৪] *সাপ্তাহিক ২০০০*, 'ওএসডি সংস্কৃতি: ভারহীন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভিড় বাড়ছে', বর্ষ ১৩, সংখ্যা ২১, ৮ অক্টোবর ২০১০।

[১৫৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি ২০১১।

[১৫৬] নীতি গবেষণা কেন্দ্র, 'স্টেট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন: ২০০৯', ফেব্রুয়ারি ২০১০।

[১৫৭] *নিউ এইজ*, ২৫ জানুয়ারি ২০০৯।

[১৫৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৭ নভেম্বর ২০০৯।

[১৫৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ জুলাই ২০১১। উল্লেখ্য, বিএনপি-জামায়াতের জোট সরকারের সময় পাঁচ বছরে (২০০১-২০০৬) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা ছিল ২৮৬, এর আগের আওয়ামী সরকারের সময় (১৯৯৬-২০০১) এই সংখ্যা ছিল ৭৭।

[১৬০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি ২০১১। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের মেয়াদের শেষে ওএসডি'র সংখ্যা ছিল ৩৫৫ জন, যেখানে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষে ছিল ১৭৪ জন, এবং ২০০৬ এর অক্টোবরে আবার বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষে ছিল ৭৫৮ জন (সূত্র: শাহেদুল আনাম খান, 'ওএসডি'স অ্যান্ড কন্ট্র্যাকচুয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস', *ডেইলি স্টার*, ২০ আগস্ট ২০০৯)।

[১৬১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জানুয়ারি ২০১১।

এছাড়াও সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট শূন্য পদের ৯০% পর্যন্ত নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে না বলে আরেকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা ২০১০ এর ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা।[১৬২]

অন্যদিকে দেখা যায় সরকারের এই সময়ে বেশিরভাগ নিয়োগ স্বাভাবিকভাবে হয়নি। বিভিন্ন অনিয়ম, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮ মাসে ৯,০৯৫টি পদের জন্য নিয়োগ বা চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত রাখা হয়। এর মধ্যে ছিল অর্থ, স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পাবনা ও পঞ্চগড় জেলা প্রশাসনে নিয়োগ, এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সব নিয়োগ প্রক্রিয়া।[১৬৩] এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল পাবনায় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ক্যাডারদের পরীক্ষাকেন্দ্রে হামলা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা,[১৬৪] এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কর্মীদের বাইরে থেকে নিয়োগ না দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য উপদেষ্টার খোলাখুলি ঘোষণা[১৬৫]। এছাড়াও রেলওয়ে বিভাগে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ,[১৬৬] পুলিশ বিভাগে নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। এমনকি দক্ষতা পরীক্ষা ছাড়াই এই সরকারের সময় প্রায় দশ হাজার যানবাহন চালানোর পেশাদার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং আরও প্রায় সাড়ে ২৪ হাজার লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা যায়, যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় দেওয়া হচ্ছে।[১৬৭]

৭.৫.২ সরকারি কর্মকাণ্ডে কম্পিউটারায়ন ও ই-গভার্নেন্স চালু

সরকার গঠনের পর থেকে সরকারি কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন ও ই-গভার্নেন্স চালু করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি; ই-মেইল ব্যবস্থায় নোটিশ, সার্কুলার ও চিঠিপত্রের কপি ডাকে প্রেরণের পাশাপাশি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো; বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রুপ ই-মেইল তৈরি।
- দাপ্তরিকভাবে কর্মকর্তাদের যোগাযোগের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবহারকে সচিবালয়ের নির্দেশমালাতে অন্তর্ভুক্ত করা; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, ৬৬৫ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে একটি করে ল্যাপটপ, ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট মডেম ও স্ক্যানার প্রদান।
- সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের A2I প্রোগ্রামের আওতায় একটি করে জেলা ওয়েব পোর্টাল তৈরি;[১৬৮] এর মধ্যে রয়েছে ক) ওয়েবসাইট[১৬৯], খ) ওয়েবমেইল, গ) ওয়েব এনাবেল পিএমআইএস[১৭০], ঘ) পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস), ঙ) লাইভ কমিউনিকেশন (মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে), চ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর), ছ) বেতন বিল কম্পিউটারায়ন, এবং জ) সচিবালয় গ্রন্থাগারের কম্পিউটারায়ন।

---

[১৬২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ নভেম্বর ২০১০। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট প্রায় আড়াই লাখ পদ শূন্য রয়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে প্রায় ১৫ হাজার, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে প্রায় ১৩ হাজার, তৃতীয় শ্রেণীর পদে প্রায় এক লাখ দুই হাজার, এবং চতুর্থ শ্রেণীর প্রায় ৪২ হাজার পদ শূন্য ছিল।

[১৬৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০। উল্লেখ্য, সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ২০১০ এর আগস্ট পর্যন্ত ৪৬,৫০২টি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ছাড়পত্র দেয়।

[১৬৪] ২০১০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পাবনায় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষায় স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বাধা দেন। এক পর্যায়ে এসব কর্মী বাহিনী পরীক্ষাকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করে (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০)। পরবর্তীতে একযোগে ডিসি-এসপিসহ জেলা প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়, এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে ওএসডি করা হয়।

[১৬৫] ২০১০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানে বলেন যে কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১৩,৩৫০টি পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে এবং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে দলের (আওয়ামী লীগের) বাইরের কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে না (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০)। এমনকি পরবর্তীতে তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে তিনি মনে করেন ২০০১ সাল থেকে যারা বঞ্চিত তাদেরই এ ধরনের সরকারি পদে নিয়োগে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০)। পরবর্তীতে এসব ক্লিনিকে স্বাস্থ্যকর্মী পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই স্বাস্থ্য বিভাগ চাকরিপ্রার্থীদের আগাম পুলিশি তথ্য সংগ্রহ করছে। পুলিশ তথ্য সংগ্রহের সময় 'দলীয় পরিচয়' সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করছে বলে অভিযোগ ওঠে (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ আগস্ট ২০১১)।

[১৬৬] *ডেইলি স্টার*, ২৭ জুলাই ২০১১।

[১৬৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ ও ১৮ আগস্ট ২০১১।

[১৬৮] ২০০৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রেগুলেটরি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে A2I প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের গেজেট প্রকাশের নিমিত্তে ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে সংস্থাপন মন্ত্রালয়ের লোকপ্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র কর্তৃক নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটটির কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

[১৬৯] www.moestab.gov.bd, www.bgpress.go.bd, www.bpatc.org.bd।

[১৭০] www.moestab.gov.bd/pims।

- বিভিন্ন খাত ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ; এর মধ্যে রয়েছে চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রয় প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করা,[১৭১] উচ্চ আদালত ডিজিটালাইজ করা,[১৭২] ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু,[১৭৩] বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশনের (পিএসসি) দ্বারা ক্যাডার সার্ভিস কর্মকর্তাদের ডেটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ,[১৭৪] জাতীয় সংসদের সব কাজ ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ,[১৭৫] এবং জাতীয় ই-তথ্যকোষের উদ্বোধন।[১৭৬]
- জনজীবনে তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, পাবনা, কক্সবাজার ও পার্বত্য জেলার গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল ঘরে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বা মোবাইল অপারেটরের নির্ধারিত কেন্দ্রে গিয়ে দেওয়ার সুবিধা; ঢাকার গ্যাস ও টেলিফোন বিলে একই সুবিধা; রেলওয়ের কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচি, ভাড়া ও আসনপ্রাপ্যতার খবর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাওয়া; সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য ৩৩% কমানো; ৬৪টি জেলার ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন; পাঠ্যপুস্তক ইন্টারনেটে প্রকাশ; ৮০০ হেলথ সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইন্টারনেট ও মোবাইল সংযোগ; এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি থানায় ডিজিটাল জরিপের পাইলট প্রকল্প গ্রহণ ও ঢাকা জেলার জমির সব তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ;[১৭৭] ২০১৪ সালের মধ্যে সারা দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিনির্ভর করার উদ্যোগ; তিন বছরে তিন ধাপে ভূমি রেকর্ড, নামজারি ও ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কম্পিউটার স্ক্যানিং ডেটাবেজ পদ্ধতিতে ডিজিটালাইজ করার সিদ্ধান্ত।[১৭৮]
- পুলিশ বাহিনীর সেবার মান উন্নত করতে এবং দুর্নীতি কমাতে এর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করার প্রক্রিয়া শুরু; পুলিশের রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাল করা; সকল পুলিশ সদস্য এবং যানবাহনের ডেটাবেজ তৈরির উদ্যোগ।
- কয়েকটি আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে আইপি টেলিফোন লাইসেন্স প্রদান এবং রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে অনলাইনে কোম্পানি নিবন্ধন প্রক্রিয়া, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস পরীক্ষামূলকভাবে চালু।

প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে যে ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা আছে তাতে প্রায় সবক'টি মন্ত্রণালয়ে ই-নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফাইল নিষ্পত্তির ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব, যা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া সরকারি ২৫০টি ওয়েবসাইটের বেশিরভাগ হালনাগাদ করা হয় না, এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয় না। এখনো কিছু ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লিংক কাজ করে না, এবং অনেক লিংক নির্মানাধীন দেখানো হয়।

৭.৫.৩ স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন

আওয়ামী লীগের আরেকটি প্রতিশ্রুতি ছিল স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন। বর্তমান অর্থমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী সরকার সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি স্থায়ী বেতন কমিশন স্থাপনের কথা ভাবছে,[১৭৯] যদিও এখন পর্যন্ত স্থায়ী বেতন কমিশন গঠিত হয়নি। তবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর জন্য ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে সপ্তম পে কমিশন গঠিত হয়, যা ২০০৯ এর এপ্রিলে এর প্রতিবেদন জমা দেয়। সরকার সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে যার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে কেবিনেট সিদ্ধান্ত নেয়। মূল বেতনের ওপর গড়ে ৫২% হারে বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা করা হয় ২০০৯ এর নভেম্বরে।[১৮০] তবে এই নতুন পে স্কেল সরকারি ও বেসরকারি খাতে

---

[১৭১] *ডেইলি স্টার*, ১৮ ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১। চারটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এবং ইমপ্লেমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ডিভিশন (আইএমইডি) এর যৌথ পরিচালনায় একটি প্রকল্পের অধীনে এই চারটি বিভাগ কাজ করবে। এই প্রকল্পের অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাংক, এবং ২.৪ কোটি ডলার ইতোমধ্যে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ছাড় করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট এর ওপর একটি নির্দেশনা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এবং ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ওয়েব পোর্টাল চালু হয়েছে ২০০১ এর ২ জুন।

[১৭২] *ডেইলি স্টার*, ১২ ডিসেম্বর ২০১০। এই প্রক্রিয়ার অধীনে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে যেখানে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের মামলাগুলোর শুনানি সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন www.supremecourt.gov.bd

[১৭৩] *ডেইলি স্টার*, ১২ নভেম্বর ২০১০। এই তথ্যকেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন-ভিত্তিক, কম্পিউটার দ্বারা সজ্জিত ও তারহীন ইন্টারনেট সেবাসমৃদ্ধ যা জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে সেবা দিতে সক্ষম।

[১৭৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ নভেম্বর ২০১০। এর মধ্যে ১২টি ক্যাডারের ডেটাবেজ তৈরি, এবং অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ডেটাবেজ তৈরির কাজ চলছে।

[১৭৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ নভেম্বর ২০১০।

[১৭৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১। দুই শতাধিক সরকারি-বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) যৌথভাবে এই ই-তথ্যকোষ তৈরি করে।

[১৭৭] মুনির হাসান, 'তথ্যপ্রযুক্তি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০১০।

[১৭৮] এটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ২৩১ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের একটি অংশ হিসেবে সারা দেশের ভূমি জরিপ করা হবে ২০১৩ সালের মধ্যে (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ নভেম্বর ২০১০; *ডেইলি স্টার*, ৩ জানুয়ারি ২০১১)।

[১৭৯] *ডেইলি স্টার*, ১৫ জানুয়ারি ২০০৯।

[১৮০] *ডেইলি স্টার*, ১২ নভেম্বর ২০০৯।

নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যকার বেতন-ভাতা সংক্রান্ত বর্তমান বৈষম্য দূর করতে পারেনি বলে অভিমত পাওয়া যায়, যেখানে এই দুই খাতে একই ধরনের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য প্রয়োজন।

৭.৫.৪ স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন

স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন ছিল আরেকটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২০১০ এর এপ্রিলে।[১৮১] এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিশন হবে ১৭ সদস্যের ছয় মাস মেয়াদি, এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব বা ভারপ্রাপ্ত সচিব কমিশনের সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকবেন।

পোশাক-শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করার জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট মজুরি বোর্ড ২০১০ এর ২৯ জুলাই তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য সাত ধাপের খসড়া মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে, যা নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এই মজুরি কাঠামোতে সর্বনিম্ন তিন হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়, এবং গড়ে ৮০% মজুরি বাড়ানো হয়।[১৮২] এক্ষেত্রে শ্রমিকদের অসন্তোষ অব্যাহত রয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় শ্রমনীতির খসড়া চূড়ান্ত করে যেখানে সব কর্মক্ষম মানুষের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, দ্রব্যমূল্যের সাথে সংগতি রেখে নিয়মিত মজুরি পর্যালোচনা, নারী ও পুরুষের সমান মজুরি, শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ, শিশুশ্রম নিরসন এবং অভিবাসী শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৮৩]

৭.৫.৫ ন্যায়পাল নিয়োগ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়পাল নিয়োগ ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অঙ্গীকার। তবে সরকার গঠনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়নি, বরং কর ন্যায়পাল পদটিকে অবলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ফলে পূর্বে নিযুক্ত কর ন্যায়পালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন করে কাউকে নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।[১৮৪] ২০১০ এর ১৩ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় 'কর ন্যায়পাল (অবলুপ্তি) বিল, ২০১০' অনুমোদন করা হয়। এটি সংসদে আইন হিসেবে পাস হয় ২০১১ সালের ১৫ জুন, যার মাধ্যমে 'কর ন্যায়পাল আইন, ২০০৫' বাতিল করা হয়। এর ফলে কর ন্যায়পাল পদ এবং এর সব কার্যক্রম রহিত করা হয়।

৭.৫.৬ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ ছিল ইতিবাচক, যার মধ্যে জনপ্রশাসন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ, নন-ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা জারি, সরকারি কর্মকাণ্ডে কম্পিউটারায়ন, বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, বিভিন্ন খাত বিশেষকরে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ, সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা, এবং তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা উল্লেখযোগ্য। তবে অন্যদিকে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে রাজনৈতিক বিবেচনা, রাজনৈতিক বিবেচনায় ওএসডি করা, এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত ছিল। স্থায়ী বেতন কমিশন ও স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠনেও সরকারের কোনো উদ্যোগ ছিল না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ন্যায়পাল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হলেও কোনো প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়নি, বরং কর ন্যায়পাল পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে।

সারণি ৭: প্রশাসনের সংস্কার সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা	▪ সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১০ এর খসড়া অনুমোদন; নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন; 'নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা-পদোন্নতি) বিধিমালা ২০১১' জারি ▪ প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদের ৫০% পূরণে সরকারি কর্ম-কমিশনকে সুপারিশের ক্ষমতা প্রদান; সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট শূন্য পদের ৯০% পর্যন্ত নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে না বলে সিদ্ধান্ত	▪ বিভিন্ন অনিয়ম, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮ মাসে ৯,০৯৫টি পদের জন্য নিয়োগ বা চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত ▪ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত; আড়াই বছরে চুক্তির ভিত্তিতে ২১৫ জনের নিয়োগ ▪ ৮৫১ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি না দেওয়া

[১৮১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ এপ্রিল ২০১০।
[১৮২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ জুলাই ২০১০।
[১৮৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ নভেম্বর ২০১০।
[১৮৪] *ডেইলি স্টার*, ৯ জুলাই ২০১০।

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
	▪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে প্রশাসন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিভাগ সৃষ্টি	▪ রাজনৈতিক কারণে ওএসডি করার প্রবণতা অব্যাহত; দুই বছরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৫৮
সরকারি কর্মকাণ্ডে কম্পিউটারায়ন ও ই-গভার্নেন্স চালু	▪ শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের ই-মেইল অ্যাকাউন্ট, ল্যাপটপ, ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট মডেম ও স্ক্যানার প্রদান এবং ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ ▪ নোটিশ, সার্কুলার ও চিঠিপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো; মাসিক বেতন বিল নির্ধারণের জন্য ডাটাবেজ সফটওয়্যার ব্যবহার ▪ বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ▪ বিভিন্ন খাত, যেমন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ	▪ প্রশাসনের কম্পিউটারায়নে প্রয়োজনীয় গতির অভাব ▪ সরকারি ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ না করা
স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন	▪ মূল বেতনের ওপর গড়ে ৫২% হারে বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা	▪ স্থায়ী বেতন কমিশন গঠিত না হওয়া
স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন	▪ তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত	▪ স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠিত না হওয়া
ন্যায়পাল নিয়োগ		▪ ন্যায়পাল নিয়োগ না করা ▪ কর ন্যায়পাল পদ অবলুপ্ত করা

৭.৬ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করে।[১৮৫]

বাংলাদেশ পুলিশ প্রথমবারের মত পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির (পিআরপি) সহযোগিতায় একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যা এর ভবিষ্যৎ প্রাধিকার, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মূল চেতনাকে তুলে ধরে। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় বর্তমানে প্রচলিত ঔপনিবেশিক পুলিশি ব্যবস্থাকে সমসাময়িক কালের উপযোগী পুলিশি ব্যবস্থায় রূপান্তরের দিক-নির্দেশনা রয়েছে যাতে *রি-অ্যাকটিভ* পুলিশি ব্যবস্থার পরিবর্তে *প্রো-অ্যাকটিভ* পুলিশি ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি 'বল প্রয়োগ' এর মনোভাব থেকে 'সেবা' দেওয়ার মত একটি বড় ধরনের সাংস্কৃতিক ও কৌশলগত পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হয়। ইতোপূর্বে ২০০৫ এর জানুয়ারি হতে ২০০৯ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। এর অধীনে ১৬টি 'মডেল থানা' করা হয়। বর্তমানে ১৮টি থানা নির্ধারণ করে ২০০৯ এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০৩ কোটি টাকার পাঁচ বছর মেয়াদি পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির দ্বিতীয় অধ্যায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পুলিশ বিভাগের সেবার মান বাড়াতে বর্তমান সরকার কিছু পদক্ষেপ নেয়। তার কয়েকটি হল:

- পিআরপি কর্মসূচির আওতায় পুলিশ বাহিনীর জন্য 'খসড়া পুলিশ আইন, ২০০৭' প্রস্তাব করা।
- পুলিশ এটিটিউড ফলো-আপ সার্ভের মাধ্যমে পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন।
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও মামলা তদন্ত - এই দুই ভাগে থানাগুলোকে ভাগ করে দুইজন পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া এবং পরিদর্শকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ঘোষণা।
- আসামীরা যাতে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে খালাস পেয়ে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিআইবি) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি এবং এ বিষয়ে নীতিমালা তৈরির জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তুতি।
- সকল সদস্যের জন্য সম পরিমাণ রেশন, পারিবারিক রেশন ৬০% থেকে বাড়িয়ে ১০০%, রেশনে প্রদত্ত পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রতি পুলিশ সদস্যের জন্য ৩৩০ টাকার ঝুঁকি ভাতা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।

[১৮৫] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "জনজীবনে নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে" (প্যারা ৫.৭)।

- পুলিশ বাহিনীকে দক্ষ ও যুগোপযোগী করতে এবং তদন্ত কাজ শক্তিশালী করতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পুলিশের উন্নত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সরকার গঠনের পর পুলিশ বাহিনীর শক্তিশালীকরণে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তা যথেষ্ট নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের এক সূত্র মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের অপরাধীকে গ্রেপ্তার না করায় হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি এবং টেন্ডারবাজির মতো অপরাধ অব্যাহত রয়েছে।[১৮৬] বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী নথিবদ্ধ অপরাধের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৮৭]

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে ২০০৯ এর ৪ এপ্রিল পদত্যাগ করেন। এমনকি বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়া ছাত্রলীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেন।[১৮৮] ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১০ এর জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি হিসাব অনুযায়ী আওয়ামী লীগসহ এর ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের দ্বারা মোট প্রায় ৩৯১ কোটি ৬৩ লাখ টাকার টেন্ডার দখল করার অভিযোগ ওঠে।[১৮৯] বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। চাঁদাবাজির জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে বলে জানান খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী।[১৯০] মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত সভায় প্রধানমন্ত্রী চাঁদাবাজি বন্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে জনবলের সংকট যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রশিক্ষণের অভাব। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় কয়েকটি থানায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।[১৯১]

পিআরপি'র নীতিমালা অনুযায়ী ৩২,০৩১ পুলিশ নিয়োগ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় - এর মধ্যে পুলিশ পরিদর্শক পদের কর্মকর্তা ৬৩২ জন। মঞ্জুরি হওয়া ১৬,৫৫৫টি পদের বিপরীতে ১৫,৮১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১৯২] তবে এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ, লবিং ও আর্থিক লেন-দেন হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় এবং জেলা পর্যায়ের নেতা, আমলা এবং মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সচিবরা তাদের সুপারিশকৃত প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য প্রতিনিয়ত পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মৌখিকভাবে বা চিঠির মাধ্যমে প্রভাবিত করছেন।

২০১১ এর ২ আগস্ট হাইকোর্ট বেঞ্চ চলাকালীন প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রীর সংবিধান বিষয়ক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধীদলীয় আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয়। এ সময় পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালনের সময় বিরোধীদলীয় আইনজীবীদের দ্বারা প্রহৃত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ১৩ জন আইনজীবীকে বাংলাদেশের যে কোনো আদালতে আইন ব্যবসায় নিষিদ্ধ করে এবং পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া এবং পুলিশ সদস্যকে প্রহার করার জন্য এই ১৩ জনসহ ১৪ জন আইনজীবী এবং আরও প্রায় ৪০ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে। এছাড়াও ২০১১ এর ৬ জুলাই হরতাল চলাকালীন দায়িত্ব পালনের সময় প্রধান বিরোধী দলের চিফ হুইপ ও অন্যান্য নেতাদের দ্বারা পুলিশ সদস্যরা প্রহৃত হন।

ছয়টি মহানগর বাদে দেশের ৫৩৪টি থানায় পরিদর্শক পদে দুজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার আদেশ জারি হয়। একজন তদন্ত করবেন অন্যজন প্রশাসন ও অপারেশনাল দিক দেখবেন। প্রতিটি থানায় গড়ে ১৫ জন করে জনবল বাড়ানো হয়।[১৯৩] সম্প্রতি পুলিশ বাহিনীতে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার ৬৭৩টি পদ বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[১৯৪]

---

[১৮৬] *ডেইলি স্টার*, ১৪ জুলাই ২০০৯।

[১৮৭] ২০১০ সালে নথিবদ্ধ অপরাধের ঘটনা ছিল এক লাখ ৬২ হাজার ১৭৫টি, ২০০৯ সালে এক লাখ ৫৭ হাজার ১০৮টি, ২০০৮ সালে এক লাখ ৫৭ হাজার ৯৭৯টি, ২০০৭ সালে এক লাখ ৫৭ হাজার ২০০টি, এবং ২০০৬ সালে এক লাখ ৩০ হাজার ৫৭৮টি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://www.police.gov.bd/index5.php?category=48

[১৮৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ এপ্রিল ২০০৯।

[১৮৯] বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী। এসব টেন্ডার প্রধানত এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রেলওয়ে, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বিভিন্ন স্থানীয় সরকার সংগঠনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের জন্য আহবান করা হয়।

[১৯০] *ডেইলি স্টার*, ১৭ আগস্ট ২০০৯।

[১৯১] উল্লেখ্য, বাংলাদেশে পুলিশ ও জনগণের সংখ্যার অনুপাত ১:১১৩৮, যেখানে ভারতে ১:৭২৮, ফিলিপাইনে ১:৬৬৫ এবং পাকিস্তানে ১:৬২৫ (তথ্যসূত্র: http://www.police.gov.bd/)।

[১৯২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জুন ২০১১।

[১৯৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জুন ২০১০।

[১৯৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জুন ২০১১।

৭.৬.১ *অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ*

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির দ্বিতীয় মেয়াদে বাস্তবায়ন, পুলিশ নিয়োগ, পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়নে উদ্যোগ, সব স্তরের জন্য সমান রেশন এবং ঝুঁকি ভাতা প্রদান, মাঠ পর্যায়ের থানার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা, প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত একজন ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টিসহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যা পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার পথে সহায়ক হবে। তবে এখনো পর্যন্ত 'পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১' হালনাগাদ ও সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'পুলিশ অর্ডিন্যান্স ২০০৭' চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়নি। এখনো পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত হওয়া এবং তা প্রতিরোধে সরকারি দলের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা যায়।

সারণি ৮: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা	▪ ৩২,০০০ পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত; ১৩,৩৯১ পুলিশ (এর মধ্যে ৬৩২ জন পরিদর্শক) নিয়োগের অনুমোদন; ৬৭৩টি প্রথম শ্রেণীর পদ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত ▪ 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিআইবি) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ ▪ প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত একজন ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি ▪ পুলিশ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য গাড়ি কেনা বাবদ প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ	▪ 'পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১' হালনাগাদ ও সংশোধন করে তৈরি খসড়া 'পুলিশ আইন ২০০৭' চূড়ান্ত অনুমোদন না করা ▪ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অপরাধ অব্যাহত ▪ সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি ▪ পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত ▪ পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা
বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি	▪ ট্রাফিক পুলিশের জন্য বেসিকের ৩০% ভাতা (সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা) ঘোষণা ▪ আইজিপি থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একই রেশনিং ব্যবস্থা ▪ মামলার তদন্ত করার জন্য 'তদন্ত ভাতা' ও 'ঝুঁকি ভাতা'	

৭.৭ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হয়েছে।[১৯৫] তবে সংবিধানের নির্দেশ এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন সময়ের অঙ্গীকার সত্ত্বেও বাস্তবে সব স্তরে সবসময় এসব প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়নি।[১৯৬] সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিনটি কমিশনের[১৯৭] সুপারিশের ভিত্তিতে একটি 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করে। প্রায় চার মাস কাজ করার পর এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ নবম জাতীয় সংসদ গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে আইনে পরিণত না হওয়ায় অকার্যকর হয়ে যায়। দেশব্যাপি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) সব স্তর মিলিয়ে প্রায় ৫,৩০০ প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় ৬৪,০০০ নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে।[১৯৮]

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ করে।[১৯৯]

৭.৭.১ *ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা*

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। এর মধ্যে পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান, দেশের ১৭ জেলার ৫০০ ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউরোপিয়

---

[১৯৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯।

[১৯৬] উপজেলা পরিষদ বাতিলের পর দায়ের করা 'কুদরত-ই-ইলাহী বনাম বাংলাদেশ' [৪৪ ডিএলআর (এডি)(১৯৯২)] মামলার রায়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকারের সর্বস্তরে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মত রায় দেন। বদিউল আলম মজুমদার, 'এমন বন্ধু থাকলে...', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ডিসেম্বর ২০১০।

[১৯৭] নাজমুল হুদা কমিশন ১৯৯২, রহমত আলী কমিশন ১৯৯৭ ও শওকত আলী কমিশন ২০০৮।

[১৯৮] তোফায়েল আহমেদ, 'স্থানীয় বনাম জাতীয় সরকার: দুর্বলতার রেখাচিত্র', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ মে ২০১০। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের জানুয়ারিতে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

[১৯৯] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে। জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, পরিকল্পিত পল্লী জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে"(প্যারা ৬)।

ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে ২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্প গ্রহণ,[২০০] এবং দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজের স্বচ্ছতার জন্য সাময়িকভাবে কাবিখা বন্ধ করে দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে সব দলের লোকজন কাজ করার সুযোগ পায়।[২০১]

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে সংসদে বিল উত্থাপনের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। কিন্তু দেখা যায় সংসদীয় কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ত্রুটি থাকার কারণে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯', 'উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯' ত্রুটিপূর্ণভাবে পাস হয়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা আইন সংশোধন করা হলেও উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়নি। প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারণ এবং অপরাধ ও দণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনার ফলে বর্তমান আইনে যুদ্ধাপরাধীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে। এমনকি প্রার্থীদের ব্যক্তিগত হলফনামা জমা দেওয়ার বিধানও বর্তমান আইনে নেই। তবে আইনটির জন্য ১৯টি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং সংসদীয় কমিটি তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে বলে জানা যায়।[২০২]

ইউনিয়ন পরিষদ - স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক কাঠামো হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ এর মধ্যে, যার মেয়াদ শেষ হয় ২০০৮ সালের জুনে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১০ সালের মে মাসে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি থাকলেও সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা[২০৩] সংশোধন না করায় এই নির্বাচন পিছিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯' সংসদে গৃহীত হয় ২০০৯ এর ১৫ অক্টোবর। ২০১০ এর ১২ এপ্রিল ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা সংশোধন করে সংশোধিত আইন মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়, এবং একই বছরের ৪ অক্টোবর এর খসড়া বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। এই সংশোধন অনুযায়ী পুরানো সীমানাতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এছাড়াও ২০১০ এর ১২ আগস্ট নির্বাচন কমিশন প্রথমবারের মত 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০' প্রণয়ন করে, এবং ১৫ জুলাই চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ প্রার্থীদের জন্য প্রথমবারের মত 'ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা ২০১০' প্রণয়ন করে। ২০১১ এর ২৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। তফসিল অনুযায়ী ২০১১ এর ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকার ১২ জেলার ৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদে এবং পরবর্তী তফসিল অনুযায়ী ৩১ মে থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত বাকি জেলাগুলোর ৩,৮১৩টি - মোট ৪,৩৬৬টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন সম্পন্ন হয়, এবং বাকিগুলোতে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[২০৪]

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের কথা বলা হলেও স্থানীয় সরকারকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদেরকে পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিধান রেখে ২০০৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিল ২০০৯' সংসদে উত্থাপন করা হয়। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানায়, এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা দানের উদ্যোগ বাতিল করার দাবি জানায়।[২০৫] এই দাবির প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ঐ বিধান বাদ দিয়ে সুপারিশ চূড়ান্ত করে। বিধানটি বাদ দেওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসেবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বলেন প্রস্তাবিত বিলে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে তিন সদস্যের চেয়ারম্যান প্যানেল[২০৬] করার বিধান রয়েছে। সুতরাং প্যানেল চেয়ারম্যান থাকতে প্রশাসক নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই।

---

[২০০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৭ মে ২০১০।

[২০১] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৪ মার্চ ২০১০।

[২০২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ মার্চ ২০১১।

[২০৩] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯*, ধারা ১৩ (১)। এই ধারা অনুযায়ী একটি ইউনিয়ন পরিষদের এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডের ভোটার বৈষম্য ১০ শতাংশের মধ্যে রাখতে হত। এতে ৪,৫০২টি ইউনিয়নে নতুন সীমানা নির্ধারণ করতে গেলে দেশের অগণিত গ্রাম/মৌজা বা তার অংশবিশেষ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং অহেতুক সামাজিক বিশৃঙ্খলাসহ মামলা-মোকদ্দমা বেড়ে যাওয়া এবং ফলে নির্বাচন আরও পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

[২০৪] সূত্র: ডেমোক্রেসি ওয়াচ (৫জুলাই পর্যন্ড়)

[২০৫] *ডেইলি স্টার*, ৪ অক্টোবর ২০০৯।

[২০৬] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯* এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী "পরিষদ গঠিত হইবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যানের প্যানেল, সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবেন।"

২০০৯ এর ৪ মে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় টেস্ট রিলিফ সংক্রান্ত প্রজেক্টের নির্দেশনা সংশোধন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের অন্যতম প্রধান সংগঠন ইউনিয়ন পরিষদের এই টেস্ট রিলিফ সংক্রান্ত প্রজেক্টের ক্ষেত্রে অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কোনো ভূমিকা রাখা হয়নি, যেখানে প্রজেক্টের বাছাই, অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির গঠন প্রভৃতি সংসদ সদস্যদের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সম্পন্ন হবে বলে বলা হয়েছে।[২০৭] তবে বর্তমান আইনে সাতটি মন্ত্রণালয়ের (স্থানীয় সরকার, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মৎস্য ও পশু সম্পদ, সমাজকল্যাণ, ও স্বরাষ্ট্র) ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে দেওয়া হয় বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য।[২০৮]

উপজেলা পরিষদ - সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় 'উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৮' (৩০ জুন ২০০৮) জারি করা হয় এবং ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল 'উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এই আইনে জেলা এবং উপজেলার স্থানীয় সরকারকে স্বায়ত্তশাসন না দিয়ে সংসদ সদস্যদের আধিপত্য দেওয়া হয়।[২০৯] এর পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয় যেহেতু নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা এলাকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই এলাকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে তাদের নির্ধারকের ভূমিকায় থাকতে হবে, না হলে জনগণ তাদের ভোট দেবে না।[২১০] ২০১০ সালের ৯ মার্চ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়নের জন্য ১৫ কোটি টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়।[২১১] এর আগে প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতার ভারসাম্য আনার মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হতে পারে বলে মতামত দেন,[২১২] যদিও সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিনিধি স্থানীয় সরকারের কোনো কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে পারে না।[২১৩] ফলে এই আইন অনুযায়ী উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা কমেছে।

উপজেলা নির্বাচনের পর এক বছরের বেশি সময় ধরে ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ অকার্যকর ছিল, যেহেতু চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব ও কাজ নির্ধারিত ছিল না।[২১৪] তবে ২০১০ এর ২৩ মার্চ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে 'উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০' জারি করা হয়। সরকার উপজেলা পরিষদকে কার্যকর করতে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে ২০০৯ এর ২৩ জুন। ঐ বছরের ২১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই কমিটির প্রথম সভায় উপজেলা পরিষদকে কার্যকর ও সচল করতে উপজেলা পরিষদ আইনের কিছু অংশের সংশোধন, হস্তান্তরযোগ্য অফিসের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব (চার্টার অব ডিউটিজ) কী হবে এবং জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদের বিধি-বিধান তৈরি করাসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২১৫]

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু 'উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯' লঙ্ঘন করে মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সব কর্তৃত্ব কার্যত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হাতে দেওয়া হয়। উপজেলা পর্যায়ে সরকারের দশটি মন্ত্রণালয়ের ১৩টি দফতর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এ বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয় ২০০৯ এর ১৩ ডিসেম্বর। উপজেলা পরিষদের (উপজেলা পরিষদ

---

[২০৭] *নিউ এইজ*, ৬ মে ২০০৯।

[২০৮] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯* এর ৬৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে পরিষদের সাধারণ বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার ৩য় তফসিলে বর্ণিত সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং তাঁহাদের কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিষদে হস্তান্তর করিতে পারিবে, উক্তরূপে হস্তান্তরিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিষদের ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করিবেন।"

[২০৯] ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৫ এর প্রতিস্থাপনে (১) বলা হয় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে"। (২) "সরকারের সহিত কোন বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে অবহিত রাখিতে হইবে"।

[২১০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ মে ২০১০।

[২১১] জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (একনেক) ৩০০ সংসদীয় আসনের প্রতিটির জন্য ১৫ কোটি করে মোট ৪,৬৯১ কোটি টাকার পাঁচ বছর-মেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করে। পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদের একজন চেয়ারম্যানের রিটের ভিত্তিতে হাইকোর্ট এই প্রকল্প কেন অবৈধ হবে না বলে সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চায় ২০১০ এর ১৬ আগস্ট (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ১৭ আগস্ট ২০১০)।

[২১২] *ডেইলি স্টার*, ২২ মার্চ ২০০৯।

[২১৩] সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে"। আইনজীবী ড. শাহ্‌দীন মালিকের মতে যদি সংসদ সদস্যরা স্থানীয় সরকারের কোনো কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে যায় তবে তারা তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে পারবে না (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ৭ মার্চ ২০০৯)।

[২১৪] *নিউ এইজ*, ২৪ জুন ২০০৯।

[২১৫] *দৈনিক যুগান্তর*, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৯। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে চেয়ারম্যানদের ভাতা সংক্রান্ত পাঠানো ফাইলে প্রায় তিন মাস পর অর্থ মন্ত্রণালয় এই মতামত দিয়ে আবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠায় যে, উপজেলা থেকেই তা মেটানো হবে (সূত্র: *যুগান্তর*, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৯)।

আইনের তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী) কাছে হস্তান্তরযোগ্য ১০টি মন্ত্রণালয়ের ১৩টি দফতর ন্যস্ত করার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারির পর এসব দফতরের সব কাজ দেখাশোনা করার কথা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের।[২১৬] কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। এ সংক্রান্ত কোনো ফাইল পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হয়নি।[২১৭] নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের মুখ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ও পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা করবেন এমন প্রস্তাব সংবলিত 'উপজেলা পরিষদ সংশোধন আইন ২০১০' এর খসড়ায় মন্ত্রিসভা নীতিগত অনুমোদন দেয়, যা জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় ২০১০ এর ৬ ডিসেম্বর।[২১৮]

টেস্ট রিলিফ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের দুইটি প্রধান সংগঠন উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের ওপর সংসদ সদস্যদের আধিপত্য ছিল। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নামে টিআর-কাবিখার সাধারণ বরাদ্দ আসত। তবে বর্তমানে টিআর-কাবিখার বণ্টন নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী এবারই প্রথম টিআর-কাবিখা কর্মসূচির কর্তৃত্ব সরাসরি উপজেলা চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়েছে।[২১৯]

৭.৭.২ উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা

সর্বশেষ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ২০১০ এর ১২ এপ্রিল পৌরসভার সংশোধনী আইন মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের মত পৌরসভা আইনেও নির্বাচনের জন্য সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই ওয়ার্ডের মধ্যে জনসংখ্যার ব্যবধান ১০ শতাংশের বেশি না হওয়ার[২২০] শর্তের কারণে মামলা মোকদ্দমার আশংকা ও একই কারণে আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু আইন সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতার ফলে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। ২০১০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০' এবং ৫ অক্টোবর 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০' প্রণীত হয়।

২০১০ এর ২ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। তফসিল অনুযায়ী ২০১১ সালের ১২, ১৩, ১৭, ১৮ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মোট ৩১০টি পৌরসভার মধ্যে ১৭টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি এবং মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ২৪টিতে আপাতত নির্বাচন সম্ভব নয় বলে ২৬৯টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ২৬২টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২২১] এর আগের পৌরসভা নির্বাচনগুলোতে অঘোষিতভাবে রাজনৈতিক দল বা দলীয় নেতা-কর্মীরা অংশ নিলেও এবারই প্রথম দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়।[২২২]

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ২০০৯ এর ৭ জুন সংসদে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) বিল, ২০০৯' উত্থাপন করে, যা ১৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়।[২২৩] এই বিলে প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকার, চিফ হুইপ ও অন্যান্য হুইপসহ ৩০০ জন সংসদ সদস্য নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার উপদেষ্টা হবেন বলে সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও দুই জন করে ডেপুটি মেয়র থাকা (যার মধ্যে একজন নারী সদস্য), বর্তমানের চেয়ারম্যান পদকে 'মেয়র' এবং ওয়ার্ড কমিশনারকে 'কাউন্সিলর' হিসেবে অভিহিত করা, স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌরসভার অধীনে কাজ করা প্রভৃতি সুপারিশ করা হয়, এবং স্থানীয় এলাকার সংসদ সদস্যদের পৌরসভায় উপদেষ্টার পদ ও ডেপুটি মেয়রের পদ বাতিল করা হয়।

৭.৭.৩ জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা

বাংলাদেশের সংবিধানে জেলাকে 'প্রশাসনিক একাংশ'[২২৪] হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও জেলা পরিষদের নির্বাচন কখনোই অনুষ্ঠিত হয়নি কারণ জেলা পরিষদ কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে অস্তিত্বহীন। অথচ দেশের ৬১টি পরিষদের জন্য প্রতিবছর বাজেটে গড়ে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।[২২৫] ২০০৯ এর নভেম্বরে জেলা পরিষদ নির্বাচনের আয়োজনের চেষ্টা চলছে[২২৬] বলে জানা গেলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ২০১০ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির একটি সভায় সদস্যরা

---

[২১৬] এসব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপজেলা চেয়ারম্যানদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তবে তাদের কাজ সমন্বয় করবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে জারির জন্য পরিপত্র তৈরি করা হয় (সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর*, ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ২০০৯; *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯)।

[২১৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ আগস্ট ২০১০।

[২১৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ ডিসেম্বর ২০১০।

[২১৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০১১।

[২২০] *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ১৬(১)।

[২২১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ ও ৮ ডিসেম্বর ২০১০।

[২২২] তোফায়েল আহমেদ, 'পৌর নির্বাচনের গতি-প্রকৃতি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ জানুয়ারি ২০১১।

[২২৩] http://www.ecs.gov.bd/MenuExternalFilesEng/266.pdf

[২২৪] 'প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোনো এলাকা।

[২২৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ নভেম্বর ২০০৯।

[২২৬] *দৈনিক সমকাল*, ৩ মে ২০০৯।

অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, কারণ সরকার গঠনের ১৪ মাস পরও 'জেলা পরিষদ বিল' সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। উক্ত সভায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।[২২৭] স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সম্প্রতি জানান জেলা পরিষদ আইন ২০০০ সংশোধন করে খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।[২২৮] এছাড়া চেয়ারম্যানসহ ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পাঁচ বছর মেয়াদি জেলা পরিষদ গঠনের কার্যক্রম চলছে বলে জানা যায়।[২২৯]

৭.৭.৪ সিটি করপোরেশন

২০০৯ সালের অক্টোবরে সিটি করপোরেশন নির্বাচনের আইন প্রণীত হয়।[২৩০] আইনের ৩৪ (খ) ধারা অনুযায়ী করপোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা যা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে 'সিটি করপোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০', 'সিটি করপোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০', এবং 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০' জারি করে। ২০১১ এর ১০ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা, ২০১০' প্রণয়ন করে, যেখানে সরকার চারটি নতুন সিটি করপোরেশন গঠন করার ঘোষণা দেয়।[২৩১]

২০০৭ সালের জুনে ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হয়। নির্বাচনী আইন পাশ হওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কমিশন উদ্যোগ নিতে নিতে ২০১০ সালের মে মাস চলে আসলে সরকার গরম ও বর্ষা মৌসুম নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত সময় নয় বলে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার অনুরোধ জানায়, যদিও কমিশনের পক্ষ থেকে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি চূড়ান্ত ছিল।[২৩২] পরবর্তীতে দুই জন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যকে বাছাই করা হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাজ তদারকির জন্য। তারা ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র এর সাথে বসে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেন, যেখানে বলা হয় ডিসিসি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সংসদ সদস্যের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখবে এবং জনগণের কোনো ক্ষোভ রয়েছে কিনা সেটি যাচাই করবে।[২৩৩] স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর মতে ডিসিসি'র বিদ্যমান আইনে সংশোধন আনতে হবে বলে নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছে।[২৩৪] যদিও রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে, সম্প্রতি স্থানীয় সরকার-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ডিসিসি'কে ভাগ করার বিষয়ে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা এখনও যাচাই-বাছাই পর্যায়ে রয়েছে এবং এ জন্য সরকার স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন ২০০৯ এর ৩(১) ও ৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান,[২৩৫] যদিও এই উদ্যোগ নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।[২৩৬]

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় ২০১০ সালের ৯ মে। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ২০১০ এর ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র সমর্থিত প্রার্থী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সরকার ও বিরোধী দল-দুই পক্ষই নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়।[২৩৭] এদিকে ২০০৪ সালের আগস্টে হাইকোর্টের জারি করা এক নির্দেশনায় নির্বাচিত সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের সমান মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হলেও তা প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানান চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলররা।[২৩৮]

৭.৭.৫ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সরকারের অন্যতম সাফল্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন করা। জেলা পরিষদ আইন ও সিটি করপোরেশন সংক্রান্ত আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন, এবং সাতটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ও একইভাবে দশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপজেলা

---

[২২৭] *ইন্ডিপেনডেন্ট*, ২৪ জুন ২০১০।

[২২৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ মার্চ ২০১১।

[২২৯] *প্রথম আলো*, ২৪ মার্চ ২০১১। ২০১১ এর ২৩ মার্চ সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য জানান।

[২৩০] 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৯' রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ২০০৯ এর ১৫ অক্টোবর।

[২৩১] নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল পৌরসভা নিয়ে একটি; রংপুর পৌরসভা নিয়ে একটি; টঙ্গী ও গাজীপুর পৌরসভা নিয়ে একটি; কুমিল্লা পৌরসভা ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ পৌরসভা নিয়ে একটি (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ মার্চ ২০১১)।

[২৩২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ এপ্রিল ২০১০।

[২৩৩] *নিউ এইজ*, ২২ এপ্রিল ২০০৯।

[২৩৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০১০।

[২৩৫] মিল্লাত হোসেন, 'ডিসিসি ভাগ হলে কার লাভ?', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ডিসেম্বর ২০১০।

[২৩৬] মিল্লাত হোসেন, *প্রাগুক্ত*। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলী খানের মতে যেহেতু ডিসিসি ভৌগলিকভাবে বিভক্ত নয় এবং ডিসিসির মধ্য দিয়ে কোন নদী বয়ে যায়নি এতে রাস্তাঘাট ভাগ হয়ে যাবে এবং সীমানা অংশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

[২৩৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জুন ২০১০।

[২৩৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ নভেম্বর ২০১০।

পরিষদের অধীনে দেওয়া হয়েছে। তবে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ আইনে রূপান্তরিত না করায় এটি অকার্যকর হয়ে যায়। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যা সরাসরি সংবিধান এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির খেলাপ। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিপত্র জারি করে দফায় দফায় উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা খর্ব করা, সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংসদের সঙ্গে পরামর্শ না করে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের কেন্দ্রের কাছে কোনো প্রস্তাব দিতে না পারা, এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দ্বন্দ্বসহ বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে উপজেলা পরিষদ অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সারণি ৯: শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	▪ ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ▪ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন ▪ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন ▪ সাতটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে দেওয়া; একইভাবে দশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপজেলা পরিষদের অধীনে দেওয়া	▪ স্থানীয় সরকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রথম অধিবেশনের মধ্যে পাস না করায় কমিশন বিলুপ্ত ▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব আইনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ উপজেলা পরিষদ অকার্যকর করে রাখা ▪ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা
জেলা পরিষদকে উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা		▪ জেলা পরিষদ নির্বাচন না হওয়া
উপজেলা সদরকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা	▪ ২৬২টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত ▪ স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌরসভার অধীনে কাজ করার বিধান ▪ স্থানীয় এলাকার সংসদ সদস্যদের পৌরসভায় উপদেষ্টার পদ ও ডেপুটি মেয়রের পদ বাতিল	

৭.৮ নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ ছিল অন্যতম।[২৩৯]

৭.৮.১ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' সংশোধন এবং তার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক দলগুলোকে তদারকির আওতায় নিয়ে আসা, নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা পুনর্নির্ধারণ করা, এবং ব্যক্তি ও দলের জন্য নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ করা। নির্বাচন কমিশন সংস্কারে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' প্রণয়ন[২৪০] করার মাধ্যমে, যে আদেশ এর আগের কোনো নির্বাচিত সরকারই আইনে পরিণত করেনি। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংশোধিত গঠনতন্ত্র জমা দেওয়ার সময় বাড়িয়ে এই আইন সংশোধন করা হয়।[২৪১]

---

[২৩৯] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত থাকবে"(প্যারা ৫.৩); "প্রবাসী বাঙালিদের জাতি গঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হবে ... " (প্যারা ৫.৫)।

[২৪০] ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

[২৪১] পূর্বের সময়সীমা অনুযায়ী ২০১০ এর ২৫ জানুয়ারি ছিল সংশোধিত গঠনতন্ত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী দলগুলো নির্দিষ্ট সময়ে গঠনতন্ত্র জমা না দিলে নিবন্ধন হারাবে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও ৩৯টি নিবন্ধিত দলকে এর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমান সংশোধনী অনুযায়ী ২০১০ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে দলগুলোকে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের দলীয় শাখার সুপারিশক্রমে প্রার্থী মনোনয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়।[২৪২] তবে নবম সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত সংসদ ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রণীত *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯* এ এই ধারায় কিছুটা পরিবর্তন আনে যেখানে বলা হয় "... উক্ত প্যানেল বিবেচনা করে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে", অর্থাৎ তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক না করে ধারাটিকে কিছুটা নমনীয় করা হয়। তবে সর্বশেষ দুইটি আসনের উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনীত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা। সরকার গঠনের পর ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯' প্রণয়ন করা হয় যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনা হয়। তবে এই আইনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে রাখার কথা বলা হয়েছে যা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। একইসাথে উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ২০০৮ এর শেষে প্রস্তাব পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তথ্যমন্ত্রী এ ধরনের একটি আইন প্রণয়ন করা হবে বলে সংসদে জানান।[২৪৩] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হলেও নির্বাচনের পর এ সংক্রান্ত আইন সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রণয়ন করতে পারেনি সরকার। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত একটি আদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রণীত হয়। তবে দলীয় সরকারের প্রথম সংসদ অধিবেশনে গৃহীত না হওয়ায় এই কর্তৃপক্ষ অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ২০১০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় পরিচয় পত্র সংক্রান্ত আইন প্রণীত হওয়ার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের একটি প্রকল্প হিসেবে সংযুক্তি ঘটে।

নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নিজস্ব জনবল দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান। ২০০৯ সালে প্রথমবারের মত সাতটি আসনে উপ-নির্বাচনে নিজস্ব জনবল দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য চারজন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, এবং সবগুলো উপ-নির্বাচনই সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।[২৪৪] ২০১০ এর ১৭ জুন অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নির্বাচন কমিশনের একজন উপসচিব। এসব উপ-নির্বাচনে কয়েকটি আসনে এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থীর বিজয় প্রমাণ করে যে সদিচ্ছা থাকলে ও কোনো হস্তক্ষেপ না করলে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

নির্বাচন কমিশন নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন করে। এর মধ্যে ছিল জাতীয় সংসদের বিভিন্ন উপ-নির্বাচন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং পৌরসভা নির্বাচন। এসব নির্বাচনের বেশিরভাগই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনে কয়েকটি এলাকায় সরকার-সমর্থকদের দ্বারা সহিংস ঘটনা ঘটে যার কারণে কয়েকটি কেন্দ্রে এবং কয়েকটি পৌরসভায় নির্বাচন বাতিল করে নতুন করে নির্বাচন করতে হয়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রথম পর্যায় কোনো বড় সহিংস ঘটনা ছাড়া অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছু এলাকায় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংস ঘটনা ঘটে, যার পেছনে অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দায়ী করে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া হবিগঞ্জ-১ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের উপ-নির্বাচন এবং ১২টি পৌর নির্বাচনের জন্য সরকারের কাছে সেনাবাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানানো হলেও সরকার তা করেনি। ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সরকারের দিক থেকে অনাগ্রহের কারণে এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এছাড়াও নবম জাতীয় নির্বাচনের পর দুই বছরের বেশি হয়ে গেলেও ১৯টি নির্বাচনী মামলার মধ্যে মাত্র একটির নিষ্পত্তি হয়েছে।[২৪৫]

এছাড়াও যেসব উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতায়নের সহায়ক তার মধ্যে ছিল নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতায়ন। ২০০৯ এর ২৩ জুলাই এ সংক্রান্ত আদেশ দেওয়া হয় এবং সংসদে এ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট আইন উত্থাপন করা হয় ২০০৯ এর ১৩ সেপ্টেম্বর। এই আইনের মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারবেন।[২৪৬]

---

[২৪২] *গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আদেশ*, ১৯৭২ এর ধারা ৯০ খ (১)(খ)(ঈ) অনুযায়ী "... নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নিম্নের সুস্পষ্ট বিধান থাকিবে ... সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানা ও জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেল তৈরি করিবে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড উক্ত প্যানেল হইতে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে"।

[২৪৩] *ডেইলি স্টার*, ২২ জুন ২০১০।

[২৪৪] যেসব আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেসব আসন হচ্ছে কিশোরগঞ্জ ৬, রংপুর ৬, বাগেরহাট ১, বগুড়া ৬, বগুড়া ৭, কুড়িগ্রাম ২ এবং রংপুর ৩। পরবর্তীতে ভোলা ৩, হবিগঞ্জ ১ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩ আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

[২৪৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ডিসেম্বর ২০১০। এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া মামলায় ভোলা ৩ আসনের সংসদ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয়, এবং ঐ আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

[২৪৬] *মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯*।

তবে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ক্ষমতায়িত হলেও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে দুর্বল করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি ৪৭৫টি উপজেলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রণীত উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশের মাধ্যমে নির্বাচন আয়োজন করে। সরকার গঠনের পর ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই অধ্যাদেশ সংসদে গৃহীত না হওয়ার ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে ৬ এপ্রিল সংসদে যে 'উপজেলা পরিষদ (বাতিল আইন পুনঃপ্রবর্তন ও সংশোধন) আইন' সংসদে প্রণীত হয় সেখানে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে না রেখে সরকারের হাতে দেওয়া হয়। এছাড়াও স্থানীয় সরকার নির্বাচন আইনের একটির সাথে আরেকটির অসামঞ্জস্য রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌর নির্বাচন আইনে প্রার্থীদের হলফনামা দেওয়ার বিধান থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ আইনে তা নেই। আইন প্রণয়নের আগে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শ না করায় এই সমস্যা তৈরি হয়।

এছাড়া নির্বাচনী ফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া জেলা জজ, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বদলি করা যাবে বলে যে বিধান[২৪৭] রয়েছে তাও সরকার মেনে চলেনি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিধি প্রণয়নের প্রস্তাব করে নির্বাচন কমিশন থেকে দুই দফায় সরকারের কাছে এই আইনের খসড়া পাঠানো হয়। এই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সংবিধান সংশোধন কমিটির কাছেও প্রস্তাব রাখা হয়, যা কমিটি আমলে নেয়নি বলে এ সংক্রান্ত কোনো সংশোধন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে রাখা হয়নি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে জানা যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের এই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।[২৪৮]

৭.৮.২ প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০ এ মন্ত্রিসভা অনুমোদন দেয় ২০১০ এর ২৩ আগস্ট। এই আইনটি গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর সংসদে বিল হিসেবে উত্থাপিত হয়। এই আইন অনুযায়ী যেকোনো বাংলাদেশি বিদেশে থাকা অবস্থায় তার নিজের সংসদীয় আসনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।[২৪৯]

৭.৮.৩ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালী করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে করা অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনা, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে। সফলভাবে কয়েকটি সংসদীয় আসনে উপনির্বাচন এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন আয়োজন করার মাধ্যমে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এছাড়া ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত আইরে ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য এখনো রয়েছে এবং এসব নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার এখনো সরকারের হাতে রয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন না করাও সরকারের একটি নেতিবাচক সিদ্ধান্ত।

সারণি ১০: নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার	▪ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯ প্রণয়ন; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ▪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতায়ন ▪ নিজস্ব জনবল দিয়ে উপ-নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন	▪ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের হাতে না রেখে সরকারের হাতে রাখা ▪ জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক না করা ▪ রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন না করা ▪ বিভিন্ন উপ-নির্বাচন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ▪ সংশোধিত সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা না বাড়ানো
প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা	▪ ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ	

[২৪৭] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন*, ২০০৯, ধারা ৪৪(ই)।
[২৪৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ জুন ২০১১।
[২৪৯] *ডেইলি স্টার*, ২৪ আগস্ট ২০১০।

৭.৯ মানবাধিকার নিশ্চিত করা

সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকার, শিশু ও নারী অধিকার, শিশু ও নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং প্রতিবন্ধী, দরিদ্র, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাকে সমর্থন করে এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৭ এর ২৩ ডিসেম্বর 'জাতীয় মানবাধিকার অধ্যাদেশ ২০০৭' প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। একই বছরের ১ ডিসেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও দুজন সদস্য নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করে।[২৫০]

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন করা, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি, সিডও সনদের আওতায় রিপোর্ট দাখিল, সংশোধিত শিশুনীতি চূড়ান্ত করা, শিশু আইন ২০১০ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন, ফতোয়াকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করা, এবং ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করা রয়েছে।

৭.৯.১ স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন

সরকার গঠনের পর ২০০৯ এর ১৪ জুলাই 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯' গৃহীত হয়। কমিশন গঠনের সময় তিনজন সদস্য থাকলেও পরবর্তীতে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করেন। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯' এর ৬ ধারা অনুযায়ী ৭০ বছরের বেশি বয়স্ক কোনো ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্য নন বলে কমিশনের একজন সদস্য ৭০ এর বেশি বয়সী হওয়ার কারণে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। আর একজন সদস্য প্রেষণের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং একইসাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ায় পদত্যাগ করেন। কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অবসরে যাওয়ার পর ২০১০ এর ২২ জুন রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন অধ্যাপককে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। একইসাথে একজনকে সার্বক্ষণিক সদস্য এবং পাঁচ জনকে অবৈতনিক সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৫১]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর বিধান যথাযথ প্রয়োগের জন্য ও কমিশনে দাখিল করা অভিযোগের তদন্তপরিচালনাসহ কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা ২০০৯' রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হলেও তা এখনো অনুমোদিত হয়নি।

২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১১ এর জুন পর্যন্ত ৫,৫১৪টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ এর ১২(১)(ঠ) ধারায় বলা হয়েছে, 'মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘিত হতে পারে এমন অভিযোগের ওপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা।' এছাড়া ১৪(১) ধারা মোতাবেক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পারবে।' বর্তমান কমিশনের প্রায় ১১ মাস মেয়াদ অর্থাৎ গত বছরের জুন থেকে চলতি বছরের ৯ মে পর্যন্ত ২৪৩টি অভিযোগের মধ্যে ৯৬টি নিষ্পত্তি হয়েছে, যা শতকরা ৪০ ভাগ। ২০১১ (৯ মে পর্যন্ত) সালে ১৪৭টির মধ্যে ৫৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। আগের কমিশনের সময়ে ২০১০ সালে ২০৫টির মধ্যে ১৪১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়। ২০০৯ সালে ৭২টির মধ্যে ৬১টি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়; ২০০৮ সালে ২৩টির মধ্যে ২২টি নিষ্পত্তি হয়। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত মোট অভিযোগ জমা পড়ে ৫২০টি এবং নিষ্পত্তি হয়েছে ২৯৮টি।[২৫২]

কমিশনের নিজস্ব কোনো আইনি প্যানেল না থাকায় তারা আইনি সহায়তা পেতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে। কমিশনের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ২২ ডিসেম্বর ৬২ পদের একটি জনবল কাঠামো তৈরি করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়, এবং এই অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য সহায়ক 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯' প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু এর কোনোটিই এখনো অনুমোদিত হয়নি। মধ্যবর্তী জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য বর্তমানে যুগ্ম সচিব (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), উপসচিব (আইন মন্ত্রণালয়) এবং আইন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিবকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের 'অ্যাকসেস টু জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট' হতে একজন

---

[২৫০] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "... আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ... করা হবে। মানবাধিকার লংঘন কঠোরভাবে বন্ধ করা হবে" (প্যারা ৫.২)।

[২৫১] সার্বক্ষণিক সদস্য অবসরপ্রাপ্ত সচিব কাজী রিয়াজুল হক এবং অবৈতনিক সদস্য হাই কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফওজিয়া করিম ফিরোজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক অ্যারোমা দত্ত, সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, এবং মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরু কুমার চাকমা। তবে ২৪ জুন অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন মোল্লাকে অব্যাহতি দিয়ে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিরূপা দেওয়ানকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

[২৫২] *দৈনিক আমার দেশ*, ২১ মে ২০১১।

হিসাবরক্ষক, দুইজন কম্পিউটার অপারেটর এবং একজন এমএলএসএস'কে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত মানবাধিকার কমিশনের নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইট নেই।[২৫৩]

কমিশনের অর্থের উৎস দুটি – সরকারি পর্যায়ে অনুদান/ বাজেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে অনুদান/ বাজেট। তবে সরকারি গেজেটে স্থানীয় পর্যায়ে অনুদান কারা দেবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। তাছাড়া কমিশনের আর্থিক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-এর মধ্যে ২০১০ এর ৬ মে ৪৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প (Bangladesh National Human Rights Commission Capacity Development Project) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার আওতায় তদন্ত, পরিবীক্ষণ, গবেষণা, গণশিক্ষা, এবং মানবাধিকার বিষয়ক প্রচারণার ওপর কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এবং কোরিয়া এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবে।

৭.৯.২ মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করা

বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ এবং এর পেছনে যারা রয়েছে তাদের বিচারের সম্মুখীন করার অঙ্গীকার থাকলেও এ বিষয়ে কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ দেখা যায় না। বরং ২০১০ সালে র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত বিচার-বহির্ভূত হত্যার ঘটনা অস্বীকার করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা। যদিও র‍্যাব স্বীকার করে যে, ২০০৪ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬২২ জন 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছে।[২৫৪] এই ঘটনার পাশাপাশি সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ, তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের হয়রানি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আটকদের ওপর পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর অমানবিক নির্যাতন, নারী নির্যাতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, দুর্নীতির মামলার বিচারে অনিয়ম ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটেছে।[২৫৫]

সারণি ১১: মানবাধিকার লঙ্ঘন (জানুয়ারি ২০০৯ - জুন ২০১১)

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন	**সংখ্যা**
কারা হেফাজতে মৃত্যু	১৯৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মৃত্যু*	৪১৯
গণপিটুনিতে হত্যা	৭২
সাংবাদিক নির্যাতন (ঘটনা)	৭০৮
এসিড নিক্ষেপ	১৮৯
যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন	৯২৫
ধর্ষণ	১,৪৩৭
সালিস ও ফতোয়া	৭৪
গৃহপরিচারিকা নির্যাতন	২১৮
পারিবারিক নির্যাতন	৭৮২
যৌন হয়রানি (বখাটেদের উৎপাত)	৪৯৭
মোট	**৫,৫১৪**

** ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার বা বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু হিসেবে পত্রিকায় প্রকাশিত।*
তথ্যসূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র।[২৫৬]

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে ৯৩টি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটে, ২০০৯ সালে যা ছিল ১২৫টি। গত আড়াই বছরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচার-বহির্ভূত মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে ক্রসফায়ার (গ্রেফতার ছাড়া) সবচেয়ে বেশি (৪১৯টি), এর পরে রয়েছে কারা হেফাজতে মৃত্যু (১৯৩টি)। এছাড়া গ্রেফতারের আগে ও পরে শারীরিক নির্যাতন, গ্রেফতারের পর আত্মহত্যা, গ্রেফতারের পর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ আসামির প্রতি আচরণ বিষয়ে একটি ১২ দফা নির্দেশনা জারি করে, যেখানে আটক ব্যক্তির মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশকে সচেষ্ট থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৫৭] এছাড়া কারা হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের কঠোর শাস্তির বিধান রেখে সংসদের বেসরকারি সদস্যদের বিল সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি 'নিপীড়ন ও কারা হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) বিল' অনুমোদন করে, যা

---

[২৫৩] *দৈনিক আমার দেশ*, ১৮ মে ২০১১। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের মতে, স্বতন্ত্র সচিবালয় ও আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। হাত-পা বেঁধে কাজ করার মতো অবস্থা তৈরি করে রাখা হয়েছে। কমিশনকে ২৮ জন লোক দেওয়ার কথা ছিল। এ পর্যন্ত একজনও দেওয়া হয় নি। এ জন্য তিনি সরকারী কর্মকর্তাদের দায়ী করে বলেন, মন্ত্রীরা এখনও আমলাদের বাইরে কিছু করতে পারছে না। জনবলের অভাবেই মানবাধিকার কমিশন লিমনের মতো স্পর্শকাতর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে পারেনি।

[২৫৪] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, *ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০১০*, পৃষ্ঠা ২৮২। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://www.hrw.org

[২৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২-২৮৬।

[২৫৬] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://www.askbd.org

[২৫৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ জুলাই ২০১০। নির্দেশনায় বলা হয়, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আসামিকে কোনো রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না, তার সঙ্গে শিষ্টাচারমূলক আচরণ করতে হবে, তার শারীরিক অবস্থা কেমন তা জেনে নিতে হবে, এবং হাজতে কোনো আসামি অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরবর্তীতে সংসদে উত্থাপিত হবে।[২৫৮] তবে এর পরও নিরীহ জনগণকে সাজানো মামলায় অপরাধী বানিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং এসব ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না।

কেস স্টাডি ২

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও দায়িত্বে অবহেলা: কয়েকটি কেস স্টাডি

কেস স্টাডি: লিমন

২০১১ এর ২৩ মার্চ ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে কাঠালিয়া পিজিএস কারিগরি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী লিমনকে (১৬) র‍্যাব সদস্যরা পরিচয় পাওয়ার পরও তার বাম পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। লিমনের গুলিবিদ্ধ বাম পাটি কেটে ফেলতে হয়। লিমনের মায়ের করা মামলা ১৬ দিন থানা নথিভুক্ত করেনি। ঝালকাঠি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নির্দেশে থানা বাদীর অভিযোগ এজাহার হিসেবে রেকর্ড করে। ঘটনার পর থকে র‍্যাব লিমনকে সন্ত্রাসী বানানোর চেষ্টা এবং র‍্যাবের স্থানীয় সোর্সরা লিমনের পরিবারকে ভয়-ভীতি দেখানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

লিমনকে গুলি করার প্রেক্ষিতে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ক্রসফায়ারে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে র‍্যাব, এ অভিযোগ করেন লিমনের বাবা তোফাজ্জল হোসেন এবং মা হেনোয়ারা বেগম। তাঁরা বলেন, "আমার ছেলের পক্ষ হয়ে যাঁরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁদেরকে র‍্যাবের ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে সাবধান করে দেয়া হয়েছে"। যদিও র‍্যাবের মহাপরিচালক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "লিমন ঘটনার শিকার। সে একটা ছোট ছেলে। সে সন্ত্রাসী নয়।" তারপরও লিমনকে 'দুর্বৃত্ত মিজান-মোর্শেদের সহযোগী' ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে কিশোর অপরাধ আইনের আওতায় বিচারের জন্যে ২০১১ এর ২৪ এপ্রিল 'অতি গোপনে' আলাদা অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ। এ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করলেও ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং সুশীল সমাজ সোচ্চার ভূমিকা পালন করলে আইনি প্রক্রিয়ায় লিমন ৪৭ দিন পর জামিনে মুক্তি পায়।

কেস স্টাডি: কাদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল কাদের ২০১১ এর ১৬ জুলাই রাত ১টায় খিলগাঁওয়ে অবস্থিত এক আত্মীয়ের বাসা থেকে পায়ে হেঁটে আবাসিক হলে ফেরার পথে খিলগাঁও থানা পুলিশ তাকে আটক করে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এর ফলে সে অসুস্থ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হয়। খিলগাঁও থানা পুলিশ তার বিরুদ্ধে ডাকাতির প্রস্তুতি এবং ধারালো অস্ত্র রাখার অভিযোগে দুটি মামলা করে। পরবর্তীতে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ তার বিরুদ্ধে গাড়ি ছিনতাইয়ের মামলা করে। এই ঘটনা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, সামাজিক ও সাস্কৃতিক সংগঠন এবং সুশীল সমাজ পুলিশের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে এবং কাদেরের মুক্তি চায়। এই প্রেক্ষিতে ৩ আগস্ট ঢাকা মেট্রোপলিটন আদালত কাদেরকে তিনটি মামলা হতে জামিনে মুক্তি দেন।

কাদেরের ওপর শারীরিক নির্যাতন সম্পর্কিত খবর গণমাধ্যমে প্রকাশের পর হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের নির্দেশে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক-সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন এবং তিনজন পুলিশ কর্মকর্তাকে (খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ) সাসপেন্ড করা হয়।

কেস স্টাডি: মিলন

নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ১৬ বছর বয়সী শামসুদ্দিন মিলন ২০১১ এর ২৭ জুলাই টেকেরহাটে একজন আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে তার এক বোনের সাথে সাক্ষাতের জন্য চর কাকড়া একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থামে। হঠাৎ করেই স্থানীয় লোকেরা তাকে ডাকাত বলে ধাওয়া করে। উল্লেখ্য, এই ঘটনার কিছু সময় আগে এই স্থানের কাছে রহিম মিয়ার টেক এলাকার বাসিন্দারা হাতেনাতে একটি ডাকাত দলকে ধরে এবং তাদের মধ্যে তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করে। মিলন উত্তেজিত জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে বিফল হয়। তার দাবি অগ্রাহ্য করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য তাকে ডাকাত হিসেবে কোম্পানীগঞ্জ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে থাকা পুলিশ দল মিলনকে পুলিশ ভ্যানে তুলে নেয়। ভ্যানটি টেকেরহাট মার্কেটে পৌঁছালে কৌতুহলী মানুষ আটককৃত ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলে পুলিশ তাকে কোনো রকম তদন্ত ছাড়া ডাকাত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এরপরে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত জনতা ছেলেটিকে ভ্যান থেকে নামিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। অন্যদিকে পুলিশ ছেলেটিকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা না করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই ঘটনার পর পুলিশ টিমটিকে সাসপেন্ড করা হয় এবং কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্লোজ করা হয়। তবে নিহতের মায়ের দায়ের করা মামলায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

[বিভিন্ন সংবাদপত্র, এবং অধিকার এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত]

৭.৯.১ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন এবং আইনের অধীনে একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। এছাড়াও শিশু আইন ২০১০ এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করা ইত্যাদি মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

[২৫৮] *ডেইলি স্টার*, ১১ মার্চ ২০১১।

তবে মানবাধিকার কমিশন জনবল সংকট, আর্থিক সমস্যা, প্রেষণে পদায়নসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন। এছাড়াও বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আগের মতই অব্যাহত রয়েছে।

সারণি ১২: মানবাধিকার নিশ্চিত করা সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন	▪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ প্রণয়ন ▪ কমিশনের চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক ও পাঁচ জন অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ; কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ	▪ মানবাধিকার কমিশনে জনবল নিয়োগে সরকারি উদ্যোগের অভাব ▪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা ২০০৯ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুমোদন না হওয়া
মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করা	▪ শিশু আইন ২০১০ এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন ▪ ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করা ▪ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত	▪ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত - বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের হয়রানি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আটকদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর নির্যাতন, নারী নির্যাতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে ব্যর্থতা ▪ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব

৭.১০ নারীর ক্ষমতায়ন

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সুনির্দিষ্টভাবে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলো হচ্ছে ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতির পুনর্বহাল, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা, এবং নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করা।[২৫৯]

৭.১০.১ আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৯৭ সালে প্রণীত 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'তে অন্যান্য জরুরি বিষয়ের সাথে উত্তরাধিকার, সম্পদ, ভূমির ওপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হয়। কিন্তু ২০০৪ এর নীতিমালায় 'পূর্ণ সুযোগ', 'উত্তরাধিকার', 'সম্পদ', এবং 'ভূমির উপর অধিকার' শব্দগুলো বাদ দেওয়া হয়। লক্ষণীয়, ২০০৮ এর নীতিতে সম্পদে নারীর সমান সুযোগ পুনর্বহাল করা হলেও 'পূর্ণ সুযোগ', 'উত্তরাধিকার' এবং 'ভূমির উপর অধিকার' শব্দগুলো তুলে দেওয়া হয়। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' পুনঃপ্রবর্তিত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০১১ সালের ৭ মার্চ মন্ত্রিসভা 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এর খসড়া অনুমোদন করে। নীতিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়নি, বরং উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার উল্লেখ করা হয়।[২৬০] তবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারীত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[২৬১] একদিকে মৌলবাদী মহলের বিক্ষোভ, অন্যদিকে নারী অধিকার আন্দোলনের কোনো কোনো মহলের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা সত্ত্বেও সরকারের নারী নীতি অনুমোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

৭.১০.২ প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া

প্রশাসনের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা যায়। সরকারের স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, শ্রম, এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নারী সংসদ সদস্যদের দেওয়া হয়। এর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি ও খনিজসম্পদসহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় রয়েছে। এবারই প্রথম সংসদে উপনেতা হিসেবে একজন এবং সরকারি দলের হুইপ হিসেবে আরেকজন নারী সংসদ সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এবারই প্রথমবারের মত একটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে একজন নারী সংসদ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

---

[২৫৯] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা হবে (১২.১)। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে (১২.২)। নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। নারী ও শিশু পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (১২.৩)। নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করা হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে (১২.৪)।"

[২৬০] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, অনুচ্ছেদ ২৫.২।

[২৬১] *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ২৩.৫। এখানে বলা হয়, "সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারীত্ব দেওয়া।"

৭.১০.৩ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হলেও[২৬২] সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়।

৭.১০.৪ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন মাতৃসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া বিষয়ক আইন প্রণয়ন।[২৬৩] বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ নারী সংগঠনগুলোর প্রচারণার চাপে ২০০৬ সালে সরকার এই আইন পরিবর্তন করে এবং ভুক্তভোগী শিশুদের পাসপোর্টে 'নো এন্ট্রি ভিসা' স্ট্যাম্প লাগানোর ব্যবস্থা করে। এরপর ২০০৮ সালে মায়ের সূত্রে সন্তানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার অনুমতি দেয়। বর্তমান সরকার এই পরিবর্তনগুলো গ্রহণ করে এবং মাতৃসূত্রে সন্তানদের নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়ে 'দ্য সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০০৯' প্রণয়ন করে। এর মাধ্যমে কোনো বাংলাদেশি নারী কোনো বিদেশিকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পাবে।[২৬৪]

জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে নারী শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পৃথক অধ্যায় রাখা হয়েছে যেখানে নারীশিক্ষা খাতে নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখার কথা বলা হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২৬৫] এছাড়া অভিভাবক হিসেবে মায়ের নাম দিয়ে এসএসসি ও এসএইচসি পরীক্ষায় নিবন্ধন করা যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৬৬] উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে চারটি এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে দশটি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডারভিত্তিক বাজেট চালু করা হয়েছে।

মুসলিম শরিয়া আইন ঠিক রেখে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীদের বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করতে নতুন আইন প্রণয়নের বিষয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।[২৬৭] আবার অন্যদিকে আইনমন্ত্রী ধর্মীয় আইনে নারীর যেসব অধিকার নির্ধারিত রয়েছে তা সংশোধন করার ক্ষেত্রে সরকারের অনীহার কথা উল্লেখ করেন।[২৬৮] বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যদি বিয়ে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক[২৬৯] করা যায় তাহলে সম্পত্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অংশ দেওয়ার বিধানও অযৌক্তিক হতে পারে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বিষয়ক কোনো আইন প্রণীত হয়নি বা নীতিগত কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। একইভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

৭.১০.৫ নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা

সরকারি দল নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশকিছু ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।

- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় পুলিশ রিফর্ম প্রজেক্টের আওতায় একটি 'ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার' চালু।[২৭০]
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিল, ২০১০ প্রণয়ন।[২৭১]
- নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি।
- উচ্চ আদালতে ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[২৬২] *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ৩২.৭। এখানে বলা হয়, "জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।"

[২৬৩] *দ্য সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০০৯*।

[২৬৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ জানুয়ারি ২০১০।

[২৬৫] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯*।

[২৬৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯। সরকার আদালতকে জানায়, আইনগতভাবে বৈধ যেকোনো অভিভাবককে শিক্ষার্থী নিবন্ধনের সময় তার অভিভাবক হিসেবে দেখাতে পারবে।

[২৬৭] *দৈনিক মানবজমিন*, ১১ ডিসেম্বর ২০০৯।

[২৬৮] *দৈনিক সংবাদ*, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯। ৩ সেপ্টেম্বর সিডও দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আইনমন্ত্রী বলেন, "দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের যাবতীয় মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু আইন পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে না। বিশেষ করে ধর্মীয় আইন অনুযায়ী নারীর যেসব অধিকার মেনে চলা হয় সেসব আইন পরিবর্তনে সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না। এক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইনের মতো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন কোনো আইন প্রণয়ন করবে না।"

[২৬৯] মুসলিম শরিয়া আইনে বিয়ে নিবন্ধনের কোনো বিধান না থাকলেও ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনে বিয়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়।

[২৭০] *দৈনিক সমকাল*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৯।

[২৭১] জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ২০১০ এর ৫ অক্টোবর (তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়)।

কিন্তু এসব আইন বাস্তবায়নে জোরালো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না যার জন্য উদ্যোগের ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। গত দুই বছরে নারীদের প্রতি সহিংসতা, বিশেষকরে নারী নির্যাতনের কারণে মৃত্যু, আত্মহত্যা, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, অ্যাসিড সন্ত্রাস ইত্যাদি ঘটনা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালে ১২,৯০৪টি, ২০১০ সালে ১৬,২১০টি, এবং ২০১১ সালের জুলাই পর্যন্ত ১০,৭৭৩টি - মোট ৩৯,৮৮৭টি নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা নথিবদ্ধ হয়।[২৭২] এর মধ্যে আলোচিত ছিল নারীদের উত্যক্ত করা এবং এর ফলে আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি।

সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনস্বার্থে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ এর ১৪ মে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে হাইকোর্ট একটি নির্দেশনামূলক রায় দেয়, যেখানে যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সংসদে কোনো আইন প্রণয়ন হওয়ার আগ পর্যন্ত এই নির্দেশনামূলক রায়কে আইন হিসেবে মেনে চলতে হবে। এছাড়াও রায় অনুযায়ী দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে অভিযোগ কেন্দ্র থাকবে।[২৭৩] এ অভিযোগ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের কমিটি থাকবে। কমিটির প্রধান হবেন একজন নারী। কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে দেবেন, এরপর দেশের প্রচলিত আইনে অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী বিচার বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।[২৭৪]

সারণি ১৩: নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা (জানুয়ারি ২০০৯ - জুলাই ২০১১)

সাল	সংখ্যা
২০০৯	১২,৯০৪
২০১০	১৬,২১০
২০১১ (জুলাই পর্যন্ত)	১০,৭৭৩
মোট	**৩৯,৮৮৭**

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পুলিশ এর ওয়েবসাইট, http://www.police.gov.bd/index5.php?category=48

নারী নির্যাতন বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল উচ্চ আদালত থেকে ফতোয়াসহ সব ধরনের বিচার-বহির্ভূত কার্যক্রম ও শাস্তি অবৈধ ঘোষণা।[২৭৫] এই রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া বৈধ বলে রায় দেন। তবে এক্ষেত্রে কোনো শাস্তি আরোপ করা যাবে না, বা কোনো ব্যক্তির অধিকার ও সম্মান ক্ষুণ্ন করা যাবে না বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়।[২৭৬] তবে ফতোয়া বৈধ ঘোষিত হওয়ার কারণে এই রায় নারী নির্যাতন বন্ধে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

নারীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধে সরকারের বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩ জুন ইভ টিজিং প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা, প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ দিয়ে কাউন্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে গোয়েন্দা পুলিশের ব্যবস্থা, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তিন স্তরের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রে পাড়া-মহল্লায়, স্কুল-কলেজে, উপজেলা এবং জেলায় সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, নারী সংগঠন, সুশীল সমাজসহ সবার প্রতি নারীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধে বখাটেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যার ফলে তারা অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে এর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে এ ধরনের উত্যক্ত করার হার কমছে বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাওয়া হিসাব থেকে জানা যায় এক বছরে উত্যক্ত করার ঘটনায় সারা দেশে ১৫০টি মামলা হয়েছে, আর সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে ৩৭৭টি; ১,২৬৯ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে আর পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ৫২০ জনকে।[২৭৭] তবে নারী নির্যাতন বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি বা এনএনপিসিকে কার্যকর দেখা যায়নি।

---

[২৭২] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, http://www.police.gov.bd/ অন্যদিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১১ এর জুলাই পর্যন্ত নারী নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা ৪,১২২টি।

[২৭৩] *নিউ এইজ* , ১৫ মে ২০০৯। এই রায় অনুযায়ী মেয়েদের উদ্দেশ্য করে যে কোনো ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য, ফোন কল, ই-মেইল, অশোভন অঙ্গভঙ্গি, পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন, ভয়ংকর দৃষ্টি নিক্ষেপ, প্রতারণা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, উত্যক্ত করা, চরিত্র হননের চেষ্টা, কুরুচিপূর্ণ শব্দ করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে শরীরের বিশেষ অংশে স্পর্শ করা যৌন নিপীড়নের শামিল।

[২৭৪] রায় অনুযায়ী নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ নেয় (সূত্র: *নিউ এইজ*, ১০ জানুয়ারি ২০০৯)।

[২৭৫] *ডেইলি স্টার*, ৯ জুলাই ২০১০। ফতোয়ার নামে বিচার-বহির্ভূত কার্যক্রম ও শাস্তি দেওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পৃথক তিনটি রিটের প্রেক্ষিতে ৮ জুলাই বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ এ রায় দেন।

[২৭৬] *ডেইলি স্টার*, ১৩ মে ২০১১।

[২৭৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১০।

৭.১০.৬ *অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ*

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনের উচ্চপদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীদের নিয়োগ, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত, এবং নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু। তবে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সরকার এখনো কোনো উদ্যোগ নেয়নি, এবং নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন যেমন সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। নারী নির্যাতন রোধে সরকারের বেশ কিছু উদ্যোগ থাকলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না।

সারণি ১৪: নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
১৯৯৭ সালের 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা	▪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন	▪ নারী উন্নয়ন নীতিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের উল্লেখ না থাকা
প্রশাসনের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগ	▪ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব - স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু; প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ ১২টি মন্ত্রণালয় ▪ সংসদীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ - সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি	
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা		▪ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি না করে মোট সংরক্ষিত আসন ৪৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি করা
নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন	▪ পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ প্রণয়ন; মাতৃসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া বিষয়ক আইন প্রণয়ন ▪ নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি ▪ সিডও সনদের আওতায় রিপোর্ট দাখিল	▪ সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বিষয়ক কোনো আইন প্রণীত না হওয়া ▪ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা	▪ শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া বৈধ ঘোষণা, তবে এর নামে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না বলে রায় ▪ যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনামূলক রায় ▪ নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান ▪ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত; প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ দিয়ে কাউন্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত ▪ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু	▪ নারী নির্যাতন অব্যাহত

৭.১১ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা, সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনের অবসান এবং বিশেষকরে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে।[২৭৮]

[২৭৮] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে" (প্যারা ১৮.১); "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে ..." (প্যারা ১৮.২)।

সরকার ২০০৯ সালে খ্রিষ্টান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করে এবং ২০১০ সালে ট্রাস্টের তহবিল এক কোটি থেকে বাড়িয়ে পাঁচ কোটি করা হয়।[২৭৯] ২০১০ এর ২৫ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি বিচারিক হাকিম আদালত থেকে সরকারিভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আটজন কর্মচারীকে ভূমি কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাহাড়িদের মধ্য থেকে একজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন-সংক্রান্ত টাস্কফোর্স পুনর্গঠন ও খাগড়াছড়ি আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন পাহাড়ি সাংসদকে নিয়োগ, এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ৩৫টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়।[২৮০]

পার্বত্য অঞ্চলের সব চাকরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ করার বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের তেমন কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। তবে ২০১১ এর ১ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত ৫% কোটা যথার্থভাবে সংরক্ষণের সুপারিশ করে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিদ্যমান বিধানানুযায়ী পাস নম্বর মোট নম্বরের ৪০% থেকে কমিয়ে ৩৫% করার সুপারিশ করা হয়। কারণ, এতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পূরণ সম্ভব না।[২৮১]

উন্নয়ন ও শান্তির নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল 'ঠেঙামুখ'কে স্থলবন্দর করার প্রস্তাব, পার্বত্য জেলাগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণের লক্ষ্যে 'স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ফোরাম' গঠনের পরিকল্পনা, বনবিভাগ কর্তৃক খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় ছয়টি মৌজায় প্রায় সাড়ে ১২ হাজার একর জমিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেওয়া প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে।[২৮২]

৭.১১.১ সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনের অবসান

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা ছিল অন্যতম। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সংবিধানে যতবার সংশোধন আনা হয়েছে কোনো সময়েই আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টিকে আমলে আনা হয়নি, অথচ তাদের উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ দুই দফায় (১৯৯৫-২০০৪ ও ২০০৪-২০১৪) 'আদিবাসী দশক' ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিকভাবে আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও স্বীকৃতির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হলেও বাংলাদেশে বিষয়টি আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।[২৮৩] এমনকি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে 'আদিবাসী' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে আদিবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়।[২৮৪] তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় কমিটি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে সংবিধান সংশোধন কমিটিকে চিঠি দেয়।[২৮৫]

তথ্য ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ২০০৯ এর ২ নভেম্বর সংসদে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত একটি বিল উপস্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়।[২৮৬] এই আইনে 'আদিবাসী' না বলে 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' বলার মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আরও খাটো করা হয়। আবার ২০১০ এর ২৮ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসককে 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার না করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে একটি চিঠি দেন।[২৮৭] সবশেষে ২০১১ সালের ৮ জুন আইনমন্ত্রী জানান সংবিধানের সংশোধনীতে 'আদিবাসী'র পরিবর্তে 'উপজাতি' ব্যবহার করা

---

[২৭৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর ২০১০। প্রধানমন্ত্রী ২০১০ এর বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই তথ্য দেন।

[২৮০] সঞ্জীব দ্রং, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৩ বছর', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ ডিসেম্বর ২০১০।

[২৮১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ মার্চ ২০১১।

[২৮২] ইলিরা দেওয়ান, 'পাহাড়িদের অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ জানুয়ারি ২০১১।

[২৮৩] ইলিরা দেওয়ান, 'সংবিধান সংশোধন ও আদিবাসীদের স্বীকৃতি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ আগস্ট ২০১০।

[২৮৪] রাহীদ এজাজ, 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী 'উপজাতি' পরিচয় চায় না', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০১০। উল্লেখ্য, ২০১০ এর ২৯ এপ্রিল নিউইয়র্কে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের নবম অধিবেশনে বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা আলোচনায় অংশ নিয়ে লিখিত বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠী নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে উপজাতি কিংবা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন বাস করে'। এমনকি ২০১১ সালের ১৬ থেকে ২৭ মে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের বৈঠকে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের প্রথম সচিব বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই বলে পার্বত্য চুক্তি নিয়ে ঐ ফোরামে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই বলে মত প্রকাশ করেন (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ মে ২০১১)।

[২৮৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০১০।

[২৮৬] *ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০*। এটি ২০১০ এর ১২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

[২৮৭] পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ প্রেক্ষিতে আদিবাসী দিবস উদযাপনের প্রাক-প্রস্তুতি সভায় ঐ চিঠির সমালোচনা করে আদিবাসী নেতারা মত প্রকাশ করেন যে, আদিবাসী না বলার সিদ্ধান্ত সরকারের নয়। সচিবেরাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আদিবাসীদের প্রতি বৈরী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ রকম চিঠি দেন (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ জুন ২০১০)।

হবে।[২৮৮] এছাড়াও এই আইনের তফসিলে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম তালিকাবদ্ধ করা হয়, যেখানে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠীর উপস্থিতি রয়েছে।[২৮৯] ফলে অবশিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও ২০১১ এর ১৫-১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও গৃহস্থালি শুমারিতে ১০ লাখ আদিবাসীর অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়।[২৯০]

সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননকে আহবায়ক করে ২০১০ এর ১০ ফেব্রুয়ারি সংসদে একটি ককাস গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে কয়েকজন সংসদ সদস্য আদিবাসী বিষয়ক যে কোনো সমস্যার কথা সংসদে উত্থাপন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর হচ্ছে।[২৯১] আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের পক্ষ থেকে ২৮ ডিসেম্বর ২০১০ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনটি পার্বত্য জেলাকে একটি বিশেষ শাসন অঞ্চল হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া, তালিকাভুক্ত ২৭টি জাতিগোষ্ঠীর বাইরে যেসকল আদিবাসী আছে তাদের তালিকাভুক্ত করা, সংবিধানে আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান, সংবিধানে একটি (জাতীয়) ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পরিবর্তে ৩৯টি ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।[২৯২]

তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আদিবাসীদের 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী' হিসেবে সম্বোধন করা হয়, এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্ত অবস্থান নেওয়া হয়। ২০১১ এর ২৬ জুলাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনার, উন্নয়ন-সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ও কূটনীতিকদের সাথে এক ব্রিফিং অনুষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সম্বোধন না করার আহ্বান জানান।[২৯৩] উল্লেখ্য, ২০১১ এর ২৯ জুলাই জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে (ইকোসক) আদিবাসীবিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের (ইউএনপিএফআইআই) অধিবেশনের প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে তিনটি কারণে বাংলাদেশের আপত্তি ছিল - প্রথমত, সরকারের মতে ফোরাম এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করেছে। কারণ, সরকার যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশেষ বিবেচনায় এনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করছে তখন 'আদিবাসী' বলে নতুন বিতর্ক উসকে দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিবেদনটির নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। তৃতীয়ত, ওই প্রতিবেদন তৈরির সময় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মন্তব্য নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[২৯৪]

সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' এর সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি এতে সমর্থন দিয়ে সংসদ অধিবেশনে আইন পাস করার কথা বলেন।[২৯৫] ২০১০ এর ৭ ডিসেম্বর সংসদে এই আইনের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু এখনো তা প্রক্রিয়াধীন।

৭.১১.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকার এবং জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয়, এবং এর অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর ৫০টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়। ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০৯ সালের আগস্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা শুরু হয়। পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন হিসেবে সরকার ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প ও একটি ব্রিগেড প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত ঐ ব্রিগেড প্রত্যাহার করা হয়নি। বিএনপি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করার কারণে অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মত দেয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙ্গালী অধিবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় পাহাড়িদের বিরোধের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা। তাদের মতে ১৩ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা কমিটি গঠন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।[২৯৬]

---

[২৮৮] *ডেইলি স্টার*, ৯ জুন ২০১১।

[২৮৯] *ডেইলি স্টার*, ৩১ জুলাই ২০১০।

[২৯০] জোবাইদা নাসরীন, '২০১১ সালের শুমারি: বাদ পড়বে ১০ লাখ আদিবাসী!', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ মার্চ ২০১১।

[২৯১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ জুলাই ২০১০।

[২৯২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ ডিসেম্বর ২০১০।

[২৯৩] এর পেছনে কারণ হিসেবে তিনি বলেন এ বিষয়টিকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দেওয়া হলে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন আইএলও কনভেনশন-১৬৯ এ উল্লেখ আছে পাহাড়িরা নয়, বাঙ্গালীরাই এ দেশের আদিবাসী। অন্যদিকে চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়ের মতে, আইএলও কনভেনশনের-১৬৯ বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেনি। বরং কনভেনশনের-১০৭ বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে যেখানে তিন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ জুলাই ও ৮ আগস্ট ২০১১)।

[২৯৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ আগস্ট ২০১১।

[২৯৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১০।

[২৯৬] রাজা দেবাশীষ রায়ের সাক্ষাৎকার, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ এপ্রিল ২০১০।

আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি সময়-সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য বলে ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ২০০১ সালের ১৭ জুলাই গঠিত হয়। এই কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং পার্বত্যাঞ্চলে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন' ২০০১ সালে জাতীয় সংসদে গৃহীত হলেও তাতে চুক্তির সাথে ১৯টি ধারার অসঙ্গতি আছে বলে দাবি করে আসছে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ। যেমন ভূমি কমিশনে পাঁচ জন সদস্যের[২৯৭] মধ্যে তিনজন সদস্য আদিবাসী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কমিশনের আইনানুযায়ী সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের মতবিরোধ দেখা দিলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত মূল সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিপন্ন হবে। এ কারণে কমিশনের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই অনুপস্থিত থাকেন। এসব ধারা সংশোধনের জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।[২৯৮]

ভূমি জরিপ নিয়ে আদিবাসী ও ভূমি কমিশনের যে বিরোধ তার প্রধান কারণ মূলত চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তের প্রাধান্য। পার্বত্য তিন জেলায় ভূমি জরিপ শুরু করার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের আইন অনুযায়ী রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় জরিপকাজ শুরু করার ওপর জোর দেন। এই প্রেক্ষিতে কমিশনের অন্য তিনজন সদস্য[২৯৯] ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি দিয়ে জানান যে, এটি গণতান্ত্রিক নীতি ও চর্চার বিরোধী। তাছাড়া ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আগে জরিপ করা হলে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ এর (ঘ) ধারার লঙ্ঘন হবে।[৩০০] জরিপের মাধ্যমে জমির অবৈধ দখলদারের স্বত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে বলে অনেক আদিবাসী জমির মালিকানা হারাবে বলে আশংকা রয়েছে। তবে গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির তৃতীয় সভায় 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন ২০০১' সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সভায় কমিটির আহবায়ক শীতকালীন সংসদ অধিবেশনে আইনের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো উত্থাপন করে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের কার্যক্রম আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩০১]

ভূমি বিরোধ নিয়ে ২০১০ এর শুরু থেকেই আদিবাসী-বাঙ্গালী উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পরিণতিতে বাঘাইছড়িতে ধারাবাহিক সহিংসতার ফলে দুইজন পাহাড়ি ও খাগড়াছড়িতে একজন বাঙ্গালীর মৃত্যু, এবং খাগড়াছড়িতে ১১৭ ও বাঘাইছড়িতে ৪৭৪ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩০২] টানা ছয় দিন ১৪৪ ধারা জারি থাকার পর তা প্রত্যাহার করা হয় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে।[৩০৩] এই ঘটনার সময় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি দিলেও ঘটনার এক বছর পরও দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায়নি।[৩০৪] এর পরও বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন সহিংস ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১১ এর ১৭ ফেব্রুয়ারি একজন বাঙ্গালীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটি জেলার লঙ্গদু উপজেলায় জুম্মা জনগোষ্ঠীর ওপর বাঙ্গালীদের হামলা।

আঞ্চলিক পরিষদ আইন (১৯৯৮) ও সংশোধিত জেলা পরিষদ আইনের (১৯৯৮) বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০০০ সালে এবং ২০০৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে হাইকোর্টে আরেকটি রিট দায়ের করা হয়।[৩০৫] এই দুটি রিটের ওপর ভিত্তি করে হাইকোর্ট রুল জারি করে, যেখানে সরকারকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় কেন পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং এ সংক্রান্ত আইনকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না। ২০১০ সালে রিট দুটির রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানির পর ১২ এপ্রিল থেকে আদালত রায়

---

[২৯৭] একজন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম), সার্কেল চীফ (চাকমা রাজা), আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

[২৯৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ জুন ২০১১। উল্লেখ্য, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের সাথে চুক্তির বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে ১৯ দফা সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এই অনুসারে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হওয়ার পর 'ভূমি কমিশন আইন' প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। এরপর আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ এর ৭ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে সরকারের কাছে আবার সুপারিশ পাঠানো হয়। ২০০৯ এর ২৬ আগস্ট আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি দলের সাথে ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই স্থগিত করা হয়।

[২৯৯] চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, বোমাং রাজা অং সোয়ে প্রু চৌধুরী ও মং রাজা সাচিং প্রু চৌধুরী।

[৩০০] *পার্বত্য শান্তিচুক্তি* ১৯৯৭ এর (ঘ) তে বলা হয়েছে যে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ইত্যাদির পুনর্বাসন ও ভূমিহীন পাহাড়িদের জমি বণ্টনের পরই ভূমি জরিপ করা হবে।

[৩০১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

[৩০২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০; *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৩ মার্চ ২০১০।

[৩০৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

[৩০৪] ইলিরা দেওয়ান, 'ফিরে দেখা বাঘাইছড়ি: দোষীদের বিচার কি হবে না?' *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

[৩০৫] প্রথম রিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা মো. বদিউজ্জামান এবং দ্বিতীয় রিট সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তাজুল ইসলাম করেন। প্রথম রিটের প্রেক্ষিতে ২০০০ এর ২৯ মে আদালত রুল জারি করে, এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে শান্তিচুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তিনি সম্পূরক আবেদন করেন। তাজুল ইসলামের রিটের প্রেক্ষিতে ২০০৭ এর ২৭ আগস্ট আদালত রুল জারি করে। আদালত প্রথম রিটের আংশিক গ্রহণ করলেও চুক্তি নিয়ে দ্বিতীয়বার করা সম্পূরক আবেদন ও অপর রিটের রুল খারিজ করেন (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ এপ্রিল ২০১০)।

দেন। এই রায় অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করা হয়।[৩০৬] রায়ে চুক্তি প্রসঙ্গে বলা হয় যে এটি একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবদমান দুটি পক্ষের মধ্যে অন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সমঝোতা, যাকে শান্তিচুক্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। এর মাধ্যমে একটি অনগ্রসর গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, যা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।[৩০৭] রায়ের পাঁচ দফা দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বলা হয় আঞ্চলিক পরিষদের আদলে সরকার ইচ্ছা করলে বিধিবদ্ধ সংস্থা তৈরি করতে পারে, যার সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। রায়ে জেলা পরিষদ আইনের চারটি ধারা সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তা বাতিল ঘোষণা করা হয়।[৩০৮] তবে পরবর্তীতে হাইকোর্টের এই রায় ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়, এবং এর মধ্যে সরকারকে লিভ-টু-আপিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩০৯] সরকার লিভ-টু-আপিল করলে ২০১১ এর ৩ মার্চ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত সাত বিচারপতির বেঞ্চ আপিল মঞ্জুর করে হাইকোর্টের দেওয়া স্থগিতাদেশ বহাল রাখে।[৩১০]

৭.১১.৩ *অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ*

ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নে সরকারের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ হচ্ছে জাতীয় সংসদে আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার। তবে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে ব্যর্থতার কারণে এরূপ অগ্রগতি তাৎপর্যহীন হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বরং আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' ও 'উপজাতি' বলার মাধ্যমে বির্তক সৃষ্টি; আইনে মাত্র ২৭টি জনগোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের পক্ষ থেকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে জরিপের উদ্যোগ ইত্যাদি ছিল সরকারের নেতিবাচক পদক্ষেপ। ভূমির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙ্গালী-পাহাড়ী দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল।

সারণি ১৫: ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
বৈষম্যমূলক আইনের অবসান	▪ সংসদে আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন	▪ সংশোধিত সংবিধানে বাংলাদেশের সকল নাগরিককে বাঙ্গালী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে আদিবাসীদের অস্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধে অবদান অস্বীকার ▪ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' ও 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা ▪ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনে মাত্র ২৭টি জনগোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা ▪ 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' এর সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতা
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন	▪ খাগড়াছড়ি বিচারিক হাকিম আদালত থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আটজন কর্মচারীকে ভূমি কমিশনে নিয়োগ ▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার	▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের পক্ষ থেকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে জরিপের উদ্যোগ ▪ ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ না নেওয়া ▪ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙ্গালী-পাহাড়ী দ্বন্দ্ব অব্যাহত ▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একটি ব্রিগেড প্রত্যাহার না করা

৭.১২ এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

দেশের উন্নয়নে স্ব-শাসিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো (এনজিও) দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এনজিওদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সরকারি অনুমোদন প্রদান, এনজিও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার

[৩০৬] সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ কোনো স্থানীয় সরকারব্যবস্থা নয়, রাষ্ট্রের একক চরিত্র ক্ষুণ্ন করা, এবং এ আইনে পরিষদকে প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি বলে (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ এপ্রিল ২০১০)।

[৩০৭] সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"।

[৩০৮] এ আইনের ৬ (ঙ), ১১, ১৫ (খ) ও ২৮ ধারা সংবিধানের ২৭, ২৮(১) ও ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হওয়ায় তা অসাংবিধানিক বলে বাতিল ঘোষণা করা হয়। ৬(ঙ) ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হলে তা প্রমাণের জন্য উপজাতীয় হেডম্যান থেকে সনদ নিতে হবে। এই সনদ ছাড়া কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না এবং পাসপোর্ট পাবে না। ১১ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জমির মালিক না হলে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য হবে না এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। এর মাধ্যমে অ-উপজাতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়রা অগ্রাধিকার পাবে বলে ১৫(খ) ধারায় বলা হয়েছে। ধারা ২৮ এ বলা হয়েছে তিন জেলায় পুলিশ নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকারের কথা (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ এপ্রিল ২০১০)।

[৩০৯] *ডেইলি স্টার*, ১৫ এপ্রিল ২০১০।

[৩১০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ মার্চ ২০১১।

উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গঠিত হয়। সময়ের সাশ্রয় ও এনজিও কার্যক্রমের জবাবদিহিতা, আর্থিক লেন-দেনের স্বচ্ছতা, বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন ও তাদের কর্মকাণ্ডের ধরন ও পরিধি নিশ্চিত করাও এই ব্যুরোর দায়িত্ব। তবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দুর্বলতার কারণে এনজিওগুলোর কর্মসূচির সঠিক তদারকি করা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে সম্ভব নয়।[৩১১]

তবে বিভিন্ন সময় কিছু এনজিও'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করে।[৩১২]

সরকার গঠনের পর এসব নির্বাচনী অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০৯ এর ডিসেম্বরে মেয়াদোত্তীর্ণ এক হাজারের বেশি এনজিও'কে নিবন্ধন নবায়ন করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করার কারণে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ১২ মে ২০১১ পর্যন্ত ৫৪৬টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করে। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত ৫৭ হাজার ৯৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ১২ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়াধীন।[৩১৩]

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য সোস্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ হাতে নেয়। সর্বোপরি এনজিও ও দাতাদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক সীমার মধ্যে রাখতে একটি একক আইন কাঠামো গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে এনজিও-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে নেওয়ায় সব মহল হতে সরকারের সতর্ক প্রশংসা করা হয়। এরূপ আইনি সংস্কারের মাধ্যমে বাস্তবে এনজিও কার্যক্রমের সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার পথের অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হয়। তবে বর্তমানে এটি প্রক্রিয়াধীন।

এনজিও খাতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের অর্থের যোগান দেওয়া, সাধারণ জনগণের অর্থ আত্মসাৎ, এবং আয়-ব্যয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়গুলোর মধ্যে সরকার জঙ্গিদের অর্থের যোগান দেওয়ার বিষয়টি অনুসন্ধান করছে।[৩১৪] অন্যদিকে ঢালাওভাবে এনজিও খাত সম্পর্কে সরকারের কোনো কোনো মহলের নেতিবাচক উক্তি এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো কোনো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ওপর সরকারের বিভিন্ন প্রকার চাপ প্রয়োগ গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও উন্নয়ন সগযোগী হিসেবে এনজিওদের ভূমিকার সার্বিক মূল্যায়ন এবং গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য সহায়ক নয় বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন।

তুলনামূলকভাবে দ্রুত সেবা দেওয়ার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এনজিও কর্তৃক বৈদেশিক অনুদানে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মসূচি/ প্রকল্প অনুমোদনে ব্যবহৃত এফডি-৬, এফডি-৭ এবং এফসি-১ নমুনা ছক এবং আবেদনপত্র এফডি-২ সংশোধন করা হয়েছে।[৩১৫] বিভিন্ন এনজিও'র সাথে দুই দফায় পরামর্শ করে এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পরামর্শ বিবেচনায় এনে এসব সংশোধন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সব এনজিও'কে চিঠি দিয়ে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের তাগিদ দেয়।

এছাড়া এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের রয়েছে। এর জনবল ১৫ জন বৃদ্ধির অনুমোদন পাওয়া গেছে। তবে বর্তমান ভবনে বসার সংকুলনা করা সম্ভব হবে না বিধায় তা নিয়োগ করা হচ্ছে না। 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ৩০ বছর' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এই প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অগ্রগতি, এনজিও বিষয়ক আইন-কানুন, নিয়মাবলী ও দিক-নির্দেশনা, সব ধরনের ফরম ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া এনজিওগুলোর ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় এবং জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়। এর মাধ্যমে এনজিওগুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৭.১২.১ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

তুলনামূলকভাবে দ্রুত সেবা দেওয়ার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভিন্ন ফর্ম ও আবেদনপত্র সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। এনজিওগুলোর ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। জঙ্গী অর্থায়নে এনজিওদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের

---

[৩১১] নিবন্ধিত এনজিও'র সংখ্যা ১৯৯০ সালে ৩৮২টি থেকে বেড়ে বর্তমানে ২,৩৮৩টি, কিন্তু ১৯৯০ সালের অর্গানোগ্রাম এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর ১৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর তিন জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ৪৯ জন কর্মী নিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

[৩১২] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনি কাঠামোর মধ্যে স্বশাসিতভাবে তাদের নিজস্ব বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে। তবে বিধিবদ্ধ এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। তাদের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে" (প্যারা ২২)।

[৩১৩] সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর ১০ মার্চ সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে দেওয়া তথ্য (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ মার্চ ২০১১)।

[৩১৪] *ডেইলি স্টার*, ১৯ মার্চ ২০০৯।

[৩১৫] এসব নমুনা ছকগুলো ২০১০ এর ২৫ অক্টোবর হতে কার্যকর করা হয়।

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এনজিওগুলোর সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ খাতের আইন, এনজিওদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পুনর্গঠন, এবং এনজিও ও সরকারের জবাবদিহিতার মাপকাঠি পুনঃনির্ধারণের উদ্যোগ নিলেও তা বর্তমানে থেমে আছে।

সারণি ১৬: এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
এনজিওদের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	▪ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ▪ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করার কারণে ৫৪৬টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল; ১২ হাজার সংস্থার নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়াধীন ▪ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ▪ বিভিন্ন ফর্ম ও আবেদনপত্র সংশোধনের উদ্যোগ ▪ এনজিও ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা ▪ জঙ্গী অর্থায়নে এনজিওদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ	▪ এনজিও'দের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সোস্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ - এর উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক ও যথাযথ তথ্যের অভাবে এটি নিয়ে এনজিও খাতে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি

৮. নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন: প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী অঙ্গীকারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের পক্ষে জোরালো অঙ্গীকার দেখা যায়। কিন্তু নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে অন্য দলগুলো তাদের প্রতিশ্রুতির মূল চেতনার ওপর ভিত্তি করে কোনো কার্যক্রম হাতে নেয়নি, যদিও নির্বাচনে পরাজিত হলে বিরোধী দল হিসেবে কী ভূমিকা পালন করবে, কোনো দলই ইশতেহারে তার উল্লেখ করেনি। তবে ধরে নেওয়া যায় ইশতেহারে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা বিরোধী দল হিসেবেও তারা পালন করবে। এই প্রেক্ষিতে দেখা যায় প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল – যেমন সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে, এবং সংসদ কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদ সদস্যরা সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করতে পারবে না – এসব কোনোটিই তারা নিজেদের ক্ষেত্রে মেনে চলেনি (সারণি ১৭)।

সারণি ১৭: গবেষণার নির্ধারিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

ক্ষেত্র	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির সাপেক্ষে ভূমিকা
দুর্নীতি প্রতিরোধ	▪ দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতির উৎস রুদ্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা ▪ রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ক্রয়-বিক্রয় ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ▪ সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা	▪ ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা না দেওয়ার দাবি ▪ সরকারের দুদক আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
কার্যকর সংসদ	▪ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ▪ সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন ও বিরোধী দলের সদস্যদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা ▪ ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া বৈঠক বর্জন নিষিদ্ধ করা ▪ সংসদ সদস্যরা সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করলে সদস্যপদ বাতিল ▪ স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর দল থেকে পদত্যাগ ▪ বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার করা	▪ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়েই সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় না যাওয়া ▪ ধারাবাহিক সংসদ বর্জন (৭৪% কার্যদিবস) ▪ একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ৭৪ কার্যদিবস (প্রায় দশ মাস) পর সংসদে যোগদান ▪ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ
বিচার বিভাগ	▪ বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন ▪ মামলার জট নিরসনের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি পুনর্বিন্যাস ▪ বিচার বিভাগের কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতির সুযোগ নিরসন ▪ অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করা	
তথ্য অধিকার	▪ নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করতে হবে	▪ দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পদের বিবরণী স্বেচ্ছায় প্রকাশ না করা
জনপ্রশাসন	▪ প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ▪ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	

ক্ষেত্র	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির সাপেক্ষে ভূমিকা
	▪ প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ▪ প্রশাসনকে সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা ▪ সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য বেতন ও মজুরি কমিশন গঠন	
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	▪ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দমন ▪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সময়োপযোগী ও দক্ষ করে গড়ে তোলা; প্রশিক্ষণ, উন্নত সরঞ্জাম, আধুনিক অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান	
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	▪ প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রিকরণ করা ▪ সকল পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিত করা ▪ স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহাল রেখেই জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করা	▪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের প্রাধান্য নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
নির্বাচন কমিশন	▪ প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করা	
মানবাধিকার	▪ মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন ▪ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত সব আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা জোরদার করা ▪ মানবাধিকার কমিশনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দান ▪ বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা	
নারীর ক্ষমতায়ন	▪ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে কম সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ▪ নারী পেশাজীবী সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন; নারী পেশাজীবীদের আবাসন ব্যবস্থা ▪ মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি্াতক শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ ▪ অ্যাসিড ছোঁড়া আইন দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন ▪ জাতীয় সংসদসহ সকল পর্যায়ে নারীদের অধিক হারে নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি	▪ জাতীয় নারী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী	▪ অনগ্রসর পাহাড়ী ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা; তাদের জন্য চাকরি ও শিক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধা বজায় রেখে জাতীয় উন্নয়নের ধারায় অধিকতর সম্পৃক্ত করা ▪ পার্বত্য জেলায় এবং অন্যান্য স্থানে বসবাসরত উপজাতীয় ও আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা ▪ পার্বত্য অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা	▪ 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার বিষয়ে সরকারের অবস্থান এবং অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থান না নেওয়া
এনজিও খাত	▪ জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশি-বিদেশি এনজিওদের সম্পৃক্ত করা ▪ গৃহহীনদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ ব্যবস্থায় এনজিওদের সহায়তা গ্রহণ	

বিরোধী দল হিসেবে ক্রমাগত সংসদ বর্জন করে বিএনপি সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করেনি। প্রথম থেকে অষ্টম অধিবেশনের মধ্যে চারটি অধিবেশন প্রধান বিরোধী দল পুরোপুরি বর্জন করে; পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল কেবলমাত্র একটি কার্যদিবসে সংসদে আসে। প্রধান বিরোধী দল ২০০৯ ও ২০১০ সালের বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করায় তাদের অনুপস্থিতিতেই বাজেট পাস হয়। দ্বিতীয় বাজেট অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত থাকলেও পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলতে না দেওয়ার প্রতিবাদে কার্যক্রম শুরু হওয়ার ১৭ মিনিটের মধ্যে ওয়াক আউট করে, এবং পুরো বাজেট অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকে। এরপর প্রধান বিরোধী দল সংসদে যায় ২০১১ সালের ১৫ মার্চ।[৩১৬] কার্যদিবসের দিক থেকে ৭৪% কার্যদিবসেই তারা সংসদ বর্জন করে। তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে বিরোধী দলের সদস্যরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন।

বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্তমান সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেয়নি। এই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে দুদক একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এছাড়াও সংবিধান সংশোধন কমিটিতে এবং নির্বাচন কমিশনের সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি বিএনপি।

[৩১৬] প্রায় ১০ মাস ও ৭৪ কার্যদিবস পর। এর আগে বিএনপি সর্বশেষ সংসদে যায় ২০১০ এর ২ জুন।

তবে সম্প্রতি প্রথমবারের মত ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা না দেওয়ার দাবি তুলেছে বিএনপি। এছাড়া এই প্রথম ভারতের সাথে ট্রানজিট ও অন্যান্য চুক্তি প্রকাশ করার দাবিও জানিয়েছে প্রধান বিরোধী দল।

৯. উপসংহার

আওয়ামী লীগের সুশাসন সংক্রান্ত যেসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি গবেষণায় সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এসব ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম মিশ্র। একদিকে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশন ও প্রক্রিয়ার সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ছিল ইতিবাচক, অন্যদিকে দুর্নীতি দমন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সংসদকে কার্যকর করা, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের সব পদক্ষেপ ইতিবাচক ছিল না। সার্বিকভাবে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সুষ্ঠুভাবে পূরণের পথে এগিয়ে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনো প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি।

গবেষণার ফলাফল থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে যে ধারা লক্ষ করা যায় তা হল:

- দুর্নীতি দমনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার পরিবর্তে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন সংসদের স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে একদিকে সংসদ সদস্য অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা; একইসাথে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থ রক্ষা।
- স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে সরকারের নির্বাহী বিভাগ এবং জন-প্রতিনিধিদের লক্ষণীয় অনীহা।
- গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন) প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান সক্ষমতাকে দুর্বল করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা।

১০. সুপারিশ

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অনেকগুলো ই প্রত্যাশিত পর্যায়ে পূরণ হয়নি বলে ওপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য পাঁচ বছর মেয়াদের যেকোনো সময়ে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারে সরকার। ইতোমধ্যে দুই বছরের বেশি অতিবাহিত হয়েছে, এবং বাকি রয়েছে দুই বছরের বেশি। টিআইবি মনে করে অনেকগুলো ক্ষেত্রে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করবে।

যেসব ক্ষেত্রে সরকারের উত্তরণের সুযোগ রয়েছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে –

১. দুর্নীতি দমনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে শুধু এমন সংশোধন আনা উচিত যেন দুদক কার্যকর ও স্বাধীনভাবে, বিশেষকরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার না করে বিচারিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে।

২. সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের সংসদে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র চেয়ারম্যান বিরোধী দল থেকে নিতে হবে, এবং সংসদের দ্বিতীয় ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের আগে বিরোধী দল, জনগণ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো থেকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন সদস্যদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে হবে, এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি সংক্রান্ত বিল দ্রুত আইনে পরিণত করতে হবে।

৩. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪. সংবিধান ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।

৫. সরকারি খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ, এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ওএসডি করে রাখার প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এজন্য সংশোধিত পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে।

৮. মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করার জন্য একে ক্ষমতায়িত করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের আইনের আশ্রয় লাভ নিশ্চিত করা, এবং কারা হেফাজতে মৃত্যু বা নির্যাতন, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

৯. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকারের চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে, এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারীর জন্য বৈষম্যমূলক আইনের সংশোধন করতে হবে।

১০. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করার জন্য এসব জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন এবং তা অনুযায়ী কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে, যেন আদিবাসীদের ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী থাকে।

১১. এনজিও খাতের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন এ খাতের সাফল্য ও স্বকীয়তার ধারা অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ খাতকে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।